স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক সাময়িকী

৪র্থ বর্ষ ❑ প্রথম সংখ্যা ❑ অক্টোবর-নভেম্বর ২০১৪

সম্পাদক

ডা. পুণ্যব্রত গুণ

কার্যনির্বাহী সম্পাদক

ডা. জয়ন্ত দাস

সহযোগী সম্পাদক

ডা. পার্থপ্রতিম পাল ❑ ডা. সুমিত দাশ

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা

ডা. অভিজিৎ পাল ❑ ডা. অমিতাভ চক্রবর্তী
ডা. অনুপ সাধু ❑ ডা. আশীষ কুমার কুন্ডু
ডা. চঞ্চলা সমাজদার ❑ ডা. দেবাশিস চক্রবর্তী
ডা. শর্মিষ্ঠা দাস ❑ ডা. শর্মিষ্ঠা রায়
ডা. তাপস মণ্ডল ❑ ডা. সোহম সরকার

বিন্যাস ও অঙ্গসজ্জা ❑ নিত্য দাস, তরুণ বসু

প্রচ্ছদ ❑ উৎপল বসু

বিনিময় ২০ টাকা

প্রকাশক

ডা. জয়ন্ত কুমার দাস

স্বাস্থ্যের বৃত্ত-এর তরফে

ফ্ল্যাট : এফ-৩, ৫০/এ কলেজ রোড

হাওড়া-৭১১১০৩

মুদ্রক

এস এস প্রিন্ট, ৮ নরসিংহ লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় - মারী নিয়ে ঘর করি ৩

প্রচ্ছদ নিবন্ধ : **হার্ট ব্লক ও পেসমেকার** ৫
পেসমেকার নানা রকম। সব চেয়ে দামিটাই আপনার জন্য সব চেয়ে উপযোগি না হতেই পারে। কম দামি পেসমেকারে আপনার উপকার বেশি হতে পারে। কিন্তু 'বাজার' চায় আপনি কিনুন সব চেয়ে বেশি দামিটাই—লিখছেন **ডা. গৌতম মিস্ত্রী**।

প্রচ্ছদ নিবন্ধ : **ডিজাইনার বেবি-লিবেরাল ইউজেনিকস এবং কিছু আশঙ্কা** ১০
রোগের জন্য দায়ী জিন ভ্রূণকোষে বদলে দিয়ে এক জিনঘটিত অসুখ আটকানো যায়, বহু জিনঘটিত অসুখ আটকানো খুব শক্ত। আর স্বাভাবিক জিন বেছে নিয়ে বা বদলে দিয়ে রূপে গুণে 'উত্তম' মানুষ তৈরির প্রকল্প ভাল না মন্দ? লিখছেন ডা. **সুমিত্রন বসু**।

প্রচ্ছদ নিবন্ধ : **ইন্টারনেট অ্যাডিকশন** ১৫
কম্পিউটার আর ইন্টারনেট বাদ দিয়ে আজকের সভ্যতা ভাবাই যায় না। ছোট ছেলেমেয়েদেরও আজ পড়তে শিখতে ইন্টারনেট লাগে। সেই ইন্টারনেটে অ্যাডিকশন? হ্যাঁ, তাই! শুধু তাই নয়, আমেরিকান সাইকিয়াট্রি অ্যাসোশিয়েশন তাকে বেশ বড় অসুখ বলে দেখছে।
লিখছেন **রুমঝুম ভট্টাচার্য**।

প্রচ্ছদ নিবন্ধ : **পশ্চিমবঙ্গ সরকারি চিকিৎসা পরিষেবা : ঘোষণা ও বাস্তব** ১৮
সরকারি চিকিৎসা পরিষেবার ক্ষেত্রে বেশ কিছু নতুন পদক্ষেপ নিয়েছে বর্তমান সরকার। তার মধ্যে উচ্চ প্রযুক্তির সদ্যজাতের নিবিড় চিকিৎসা আছে, আছে সরকারি হাসপাতালে ন্যায্যমূল্যে ওষুধের দোকান, আছে অনেক বেশি ধরনের ওষুধ হাসপাতালে রাখার ঘোষণা, আছে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ। কিন্তু মানুষ পাচ্ছে কী, আর কতটা সে পেতে পারত? প্রশ্ন তুললেন **ডা. পুণ্যব্রত গুণ**।

প্রচ্ছদ নিবন্ধ : **সেক্স ও জেন্ডার** ২১
পুরুষ আর নারী, এই দু'টো লিঙ্গ ছাড়াও আছে অনেক শারীরবৃত্তীয় অবস্থান। মানসিকভাবেও তাই। অথচ সমাজ তাঁদের এক ছাঁচে ঢালাই করার জন্য স্টীমরোলার চালাবেই— লিখছেন **ডা. অরূপ ঢালী** ও **ডা. রঞ্জিতা বিশ্বাস**।

ক্লেফট বাচ্চাদের খাওয়ানোর সমস্যা ২৭
যে সব বাচ্চাদের তালু বা ঠোঁট, বা উভয়ই কাটা থাকে তাদেরকে খাওয়ানোর ব্যাপারে যত্ন নেবার কায়দা কানুন জানেন কম মানুষই। তাই নিয়ে লিখেছেন **অনন্যা মন্ডল**।

নবজাতকের খাদ্য-খাবার (পর্ব-৭) —স্তনদানের কিছু সমস্যা ৩১
মায়ের দুধ কম হলে কী করবেন? স্তনে ব্যথা হলে, স্তনবৃন্তে ঘা হলে? উত্তর দিচ্ছেন **ডা. স্বপন বিশ্বাস**।

এক্ল্যাম্পসিয়া আটকাতে ম্যাগ সালফ ৩৬
গর্ভাবস্থায় খিঁচুনি তথা এক্ল্যাম্পসিয়া রোগের সব চেয়ে কার্যকর ওষুধ ম্যাগনেসিয়াম সালফেট গ্রামীণ হাসপাতালে এক বড় আশীর্বাদ। কিন্তু এ রাজ্যের গ্রামের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এটা মেলে না, মেলে না এই ওষুধ ব্যবহার জানেন ও করেন এমন চিকিৎসক — লিখছেন **সোমা মুখাপাধ্যায়**।

ওভারি — সিস্ট ও টিউমার ৩৭
ওভারির সিস্ট নিয়ে আতঙ্ক খানিকটা অমূলক, খানিকটা ভুল ধারণা। কিন্তু ওভারির কিছু কিছু সিস্ট নিয়ে ভাবতেও হয় বৈকি—লিখছেন **ডা. সঞ্জীব মুখোপাধ্যায়**

প্রচ্ছদ নিবন্ধ : **স্বাস্থ্যবান বাচ্চার ঘাড়ে কালো দাগ?** ৩৯
অ্যাকানথোসিস নিগরিক্যানস নামে চামড়ার অসুখটার নাম শোনেননি অনেক ডাক্তারও। অথচ কালো দাগের এই অসুখ আজকাল খুব বাড়ছে। এমনিতে দেখতে খারাপ, কিন্তু বড় কথা হল এ রোগ ভবিষ্যতের অনেক রোগের সূচক, বিশেষ করে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে— লিখছেন **ডা. জয়ন্ত দাস**

সর্প দংশন ৪৩
সাপের কামড়ে মৃত্যু হয় আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশি। সব সাপের কামড়ের লক্ষণ এক নয়। সেই সব লক্ষণ চিনিয়ে, তার চিকিৎসার কথা লিখেছেন **ডা. শেখ মাসুম।**

দেবতার ভর পীরের ভর ৪৭
ভূতের ভর হল মানসিক অসুখ, আর দেবতার ভর প্রায় সব সময়ই ভণ্ডামি। অথচ দেবতা বা পীরের দেওয়া ওষুধ তুকতাকে অনেকের রোগ সারে, নানা সমস্যার উপায় হয়। কী ভাবে? বলছেন **অলকেশ মণ্ডল**।

প্রতিবেদন : জাপানি এনকেফালাটিস ও এবোলা ভাইরাস ৫০
একটা রোগ আমাদের ঘাড়ের ওপর হুঙ্কার ছাড়ছে। আরেকটা রোগ ছড়াচ্ছে আফ্রিকায়, কিন্তু তার মারণ গ্রাসে পড়লে নিস্তারের আশা কম। দু'টো রোগ নিয়ে একেবারে সার কথাটুকু লিখলেন স্বাস্থ্যের বৃত্তে-র **সম্পাদকীয় টিম**।

চেনা ওষুধ অচেনা কথা : ৫৩
'ঘুমের ওষুধ' অ্যালপ্রাজোলাম দিয়ে লিখছেন **ডা. সুমিত দাশ।** ছত্রাক সংক্রমণের ওষুধ মাইকোনাজোল ও কোট্রাইমোক্সাজোল নিয়ে লিখছেন **ডা. জয়ন্ত দাস**।

সত্যি-গল্প : 'পেশেন্ট পার্টি'-র রোজনামচা— শর্মিষ্ঠা দাস। ৫৪

ডায়াবেটিস রোগীদের চিকিৎসা—তিন বছরের অভিজ্ঞতা ৫৬
তিন বছর গ্রামীণ মানুষের বহুমূত্র রোগের চিকিৎসা করে নতুন কী শিখলেন সিনিয়র ডাক্তার **অভিজিৎ পাল**।

কবিতা : রেফার— শবনম ব্যানার্জি ৫৭

কালের ভালবাসা ৫৮
শারীরিক প্রতিবন্ধকতা নিয়ে ভাগ্যের সঙ্গে দুরন্ত লড়াইয়ের আত্মকথা লিখছেন **সায়মদেব মুখার্জি**

চিঠিপত্র ৬০

KLOSTER Pharmaceuticals

B/13/H/3, Braunfeld Road, Kolkata-700 027,
Phone : 033 2449-0144, Mob.: 98306 63724
E-mail : kloster_pharma@yahoo.co.in
Website : klosterpharma.com

সম্পাদকীয়

সেই কবে কবি সত্যেন দত্ত বাঙালির প্রশংসায় লিখে গেছিলেন, ''মন্বন্তরে মরি নি আমরা মারী নিয়ে ঘর করি''। তার পর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে, পৃথিবীতে জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনেক উন্নতি ঘটে গেছে, তবু মারী নিয়ে ঘর করা আজও আমাদের তেমন নাড়া দেয় না; হয়তো বা এটাই আমাদের এক গোপন 'জাতীয়' আত্মশ্লাঘা হয়ে ওঠে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে পিছিয়ে থাকা সেই সময়ে এক পরাধীন জাতির পক্ষে যা ছিল দুর্দম প্রাণশক্তির প্রকাশ, স্বশাসিত এক জাতির পক্ষে একবিংশ শতাব্দীতে এসে সেটাই যে চরম লজ্জার বিষয়, আমাদের মননে সেটা ধরা পড়ে না। তাই পরপর আসে আন্ত্রিক, ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গুর মতো পুরোনো শত্রু। তাই টিবি আর কুষ্ঠ থেকে যায়; পোলিও গণটিকাকরণ সময়ে সম্পূর্ণ করতে ব্যর্থ হই আমরা। তাই চিকুনগুনিয়া থেকে বার্ড-ফ্লু যখন দরজায় হানা দেয় তখন আমাদের স্বাস্থ্য পরিষেবার একান্ত অপ্রস্তুত অবস্থাটা হাটের মাঝে প্রকাশ হয়ে যায়।

সম্প্রতি এসেছে জাপানি এনকেফালাইটিস। জাপানি নামটা শুনে ভাবার কোনও কারণ নেই যে সেটা জাপানের নিজস্ব ব্যাপার। সারা বিশ্বে, বিশেষ করে সারা এশিয়ায়, এ রোগটা আছে বহুদিন ধরে। এটা এক ধরনের ভাইরাস-ঘটিত গুরুতর ছোঁয়াচে রোগ। তবে এক জন রোগী থেকে অন্য সুস্থ মানুষের দেহে এই ভাইরাস যেতে পারে না, কেন না মানুষের শরীরে ভাইরাস থাকে অল্প সংখ্যায়, আর অল্প কিছু দিনের জন্য। এ হল পশুপাখি থেকে আসা রোগ। বিশেষ করে শুয়োরের শরীরে এই ভাইরাস সংখ্যায় বাড়ে, অথচ শুয়োরের তেমন অসুবিধা হয় না। শুয়োরকে কামড়ানোর পর যদি সেই মশা মানুষকে কামড়ায়, তবেই সে মানুষের রোগ হওয়া সম্ভব। এ ছাড়া বক জাতীয় কিছু জলচর পাখির দেহ থেকেও মশার মাধ্যমে রোগ মানুষে আসতে পারে।

এর কোনও সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা (ভাইরাস মারার ওষুধ) নেই। তাই রোগ ছড়ানোর বিশেষ মশা (কিউলেক্স বিষ্ণুই গোত্রের) দূর করা, আর শুয়োর পালনের জায়গা থেকে দূরে থাকাই দরকার। টিকা আছে বটে, কিন্তু তা খুব বেশি পরিমাণে তৈরি করা শক্ত, আর রোগ যখন ছড়াচ্ছে তখন টিকা বিশেষ কার্যকর নয়। কেন না, টিকা দেওয়ার পরে রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্মাতে সময় লাগে, আর এ রোগের মহামারী দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

সরকার যে সব পদক্ষেপ করেছেন তাতে সরকারি স্বাস্থ্য দফতরের সুনাম বাড়েনি। আসলে জনস্বাস্থ্যের তেমন গ্ল্যামার নেই। জনস্বাস্থ্য দফতরে ভাল কাজ করলে কেউ জানতেই পারে না। কিন্তু কাজ না হলে নাগরিকের সর্বনাশ। তারই প্রমাণ জাপানি এনকেফালাইটিস নিয়ে এই অকস্মাৎ হুটোপুটি।

এই অবস্থাটা বদলানো সম্ভব। সরকার কি একটু চেষ্টা করবেন না?

❑ এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত লেখা সাধারণ মানুষের কাছে বিজ্ঞান, বিশেষত চিকিৎসাবিজ্ঞান সম্পর্কে ধারণা পৌঁছে দেবার উদ্দেশ্যে লেখা। এই পত্রিকায় প্রকাশিত লেখার ভিত্তিতে কোনও পাঠক নিজের বা অন্যের চিকিৎসা করার চেষ্টা করবেন না। সে চেষ্টা করলে ফলাফলের দায়িত্ব সম্পূর্ণ ভাবেই সংশ্লিষ্ট পাঠকের, পত্রিকার নয়।

With Best Compliments from

SHINE PHARMACEUTICALS LTD.

P-77, KALINDI HOUSING ESTATE

KOLKATA - 700089

হার্ট ব্লক ও পেসমেকার

(দ্বিতীয় পর্ব)

একটা ফোন কিনতে গেলে আপনি ভাবেন, এমনি ফোন নাকি স্মার্টফোন, টাচস্ক্রিন চাই নাকি এবং আরও কত কিছু। সামান্য ফোন কিনতে কত ভাবনা, এমনকী, নেট ঘেঁটে পড়াশোনা! অথচ শরীরের বাঁচামরা ঠিক করবে যে পেসমেকার সেটা কেমন নেবেন, সে নিয়ে একটু ভাবার দরকার বোধ করেছেন কি? না করলে আপনার প্রয়োজনীয় জিনিসটা পাবেন এমন সম্ভাবনা কম— লিখছেন **ডা. গৌতম মিস্ত্রী।**

[**পূর্ব কথন :** *স্বাস্থ্যের বৃত্তে*-র আগের সংখ্যায় (আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০১৪) আমরা জেনেছি, হার্ট বা হৃদযন্ত্র একটা পাম্প বিশেষ, যা বার বার সঙ্কুচিত আর প্রসারিত হয়, আর তার ফলে শরীরে বিভিন্ন জায়গায় রক্ত পৌঁছে যায়। ঠিকঠাক রক্ত না পৌঁছলে আমাদের শরীরে একটা কোষও খুব বেশিক্ষণ বাঁচে না। তাই হৃদযন্ত্রের সঙ্কোচন-প্রসারণ নিয়ন্ত্রণ করতে সবার হৃদযন্ত্রের ভেতরে আছে এক প্রাকৃতিক ছন্দ-নিয়ন্ত্রক তথা পেসমেকার। কম্যান্ডারের লেফট-রাইট নির্দেশের তালে তালে যেমন সৈনিকরা পা ফেলে পা তোলে, তেমনই প্রাকৃতিক ছন্দ-নিয়ন্ত্রক বা পেসমেকার 'এস এ নোড' (SA Node)-এর বৈদ্যুতিক নির্দেশ অনুযায়ী হৃদযন্ত্রের পেশিগুলো পর্যায়ক্রমে সঙ্কুচিত-প্রসারিত হয়। সমস্যা হয় এই 'এস এ নোড' কিংবা তার নির্দেশবহনকারী বিশেষ তন্তুগুলো বিগড়ে গেলে। বড় বয়সে হৃদযন্ত্রের যে সব রোগ হয় তার একটা হল হৃদযন্ত্রের নিজস্ব রক্ত সংবহন কমে যাওয়া (অ্যানজাইনা), ও শেষে বন্ধ হয়ে হৃদপেশির মৃত্যু — আমরা বলি 'হার্ট অ্যাটাক'। আর দ্বিতীয় রোগটা হল 'এস এ নোড' বা তার নির্দেশ বহনকারী বিশেষ তন্তু ইত্যাদির ব্যাধি। এতে হৃদযন্ত্রের মধ্যে বৈদ্যুতিক নির্দেশ চলাচল বন্ধ হয়— এই বন্ধ হওয়াকে এক কথায় বলে 'হার্ট ব্লক'। হার্ট ব্লকের চিকিৎসা হল কৃত্রিম পেসমেকার। প্রাকৃতিক পেসমেকার 'এস এ নোড'-এর কাজ করতে সক্ষম একটা যন্ত্র হল কৃত্রিম পেসমেকার— সেটা হৃদযন্ত্রের কাছে ঠিক মতো বসিয়ে দিলে হৃদযন্ত্রের মধ্যে বৈদ্যুতিক নির্দেশ চলাচল পুনরায় চালু হয়।]

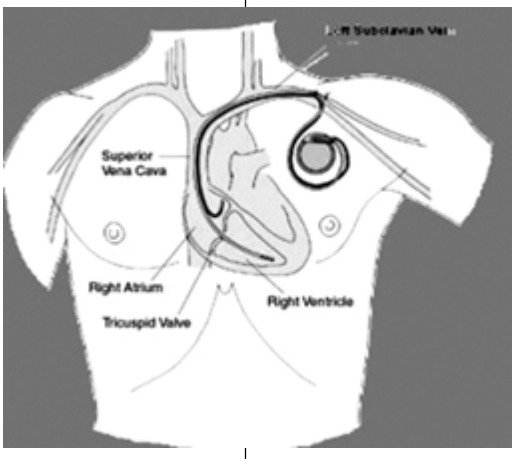

আমাদের হৃদযন্ত্র সব সময় একই হারে চলে না। আমরা যখন ব্যায়াম করি, বা মানসিক ভাবে উত্তেজিত থাকি, তখন বুকের মধ্যে হৃদযন্ত্র দ্রুত চলে, তার আওয়াজ আমরা টের পাই। আমাদের দেহে অক্সিজেনের প্রয়োজন বাড়লে হৃদস্পন্দন-হার দ্রুত করে বেশি রক্ত পাম্প করার ক্ষমতা আমাদের প্রাকৃতিক ছন্দ-নিয়ন্ত্রক তথা পেসমেকার 'এস এ নোড' (SA Node)-এর রয়েছে। যখন প্রাকৃতিক পেসমেকার খারাপ হয়ে যায় আর আমাদের কৃত্রিম পেসমেকার বসাতে হয়, সেই পেসমেকারের কিন্তু এইরকম ক্ষমতা থাকা সহজ নয়। আবার দেখুন, এ রকমটা হয়েই থাকে যে আমাদের প্রাকৃতিক পেসমেকার 'এস এ নোড' বা তার নির্দেশ বহনকারী বিশেষ তন্তু ইত্যাদির ক্ষমতা পুরোটা লোপ পেল না। হয়তো সেটা এমনিতে ভালই কাজ করে, কিন্তু মাঝে-মধ্যে হঠাৎ করে বিগড়ে যায়, অনেকটা পাগলা দাশু স্টাইলে। সে ক্ষেত্রে কৃত্রিম পেসমেকার দিয়ে সব সময় হৃদযন্ত্র চালু রাখার মানে হয় না— যখন প্রাকৃতিক পেসমেকার কাজ বন্ধ করে দেবে তক্ষুণি কৃত্রিম পেসমেকার কাজ শুরু করে দেবে, এমন হলেই ভাল হয়। আবার দেখুন, প্রাকৃতিক পেসমেকার কাজ শুরু করে হৃদযন্ত্রের ওপরের প্রকোষ্ঠ বা অলিন্দে। সেখান থেকে তড়িৎপ্রবাহ সৃষ্টি করে সে 'এ ভি নোড' (AV Node) এবং বিশেষ তন্তুকলার সাহায্যে হৃদযন্ত্রের নিচের প্রকোষ্ঠ বা নিলয়ে পাঠায়। কৃত্রিম পেসমেকার কিন্তু অলিন্দ বা নিলয়, যে কোনও জায়গায় তড়িৎ প্রবাহ শুরু করতে পারে।

কথা হল এই যে, এই সব কারণে কৃত্রিম পেসমেকারের নানা রকমফের আছে। তাতে কাজের ফারাক হয়, এবং দামের কম বেশি হয়। এই জিনিসগুলো আমাদের একটু বুঝে নিতে হবে। আসলে পেসমেকারের বাজারটায় রোগী ক্রেতা, কিন্তু তিনি কী কিনবেন সেটা নিজে ঠিক করেন না, ঠিক করেন ডাক্তার। সেটা একেবারে অযৌক্তিক তা মোটেও নয়, কেন না রোগীর রোগ ও পেসমেকারের টেকনিক্যাল ব্যাপার তিনি ভালই বোঝেন। তবু দুটো কথা থাকে। এক, আপনার শরীরে কোন জিনিস বসিয়ে ঠিক কতটা সুবিধা পাচ্ছেন সেটা বুঝে নেওয়া জরুরি, নইলে গ্রামের মাটির রাস্তায় রোলস রয়েস মোটর গাড়ি কেনার মতো অবস্থা হতে পারে—খরচা হল, কিন্তু প্রায় অকেজো হয়েই রইল জিনিসটা। আর দুই, ডাক্তারকে সব সময় পুরো ভরসা করতে আপনি পারেন না, এই কঠোর সত্যিটা এতদিনে স্বীকার করে নেওয়াই ভাল। বিশেষ করে পেসমেকারের মতো দামি যন্ত্রের ক্ষেত্রে, আপনার এমন সন্দেহ হতেই পারে হয়ত ডাক্তারবাবু আপনার স্বার্থ না দেখে কোম্পানির সুবিধা করে দিচ্ছেন। আপনার সন্দেহটা সব সময় সত্যি নয়, কিন্তু অত্যন্ত কর্মনিষ্ঠ সৎ ডাক্তার আর কোম্পানির কমিশন খাওয়া ডাক্তারের মধ্যে তফাত করার ক্ষমতা আপনার একেবারেই নেই। তাই অপাত্রে বিশ্বাস ও সুপাত্রে অবিশ্বাস, দু'টো হওয়ার সম্ভাবনাই থাকছে। তার চাইতে বরং একটু বুঝে

নিন কোন পেসমেকার কোন পরিস্থিতিতে বেশি উপযোগী, আর কোন পেসমেকার কী বিশেষ সুবিধা দেয়। তাতে আপনি ডাক্তারের সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা অনেকটাই বুঝতে পারবেন, বিচার করতে পারবেন, প্রয়োজনে দ্বিতীয় ডাক্তারের মত নিতে পারবেন।

আপনি কেন পেসমেকারের নানা কথা জানবেন?

বিশ্বের প্রথম পেসমেকার প্রতিস্থাপিত হয়েছিল ১৯৫৮ সালে। উঁহু, আজকের মতো ছোট্ট অপারেশন ছিল না সেটা। দস্তুর মতো বুকের খাঁচা চিরে, হৃদযন্ত্রের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত করা হয়েছিল সেটা, কোনও রকম তারের ব্যবহার করাই হয় নি। ওই একই বছর বর্তমান প্রযুক্তির পথিকৃৎ ফারম্যান ও রবিনসন বুকের খাঁচার বাইরে চামড়ার নিচে পেসমেকার স্থাপন করলেন, আর তার দিয়ে সেটাকে হৃদযন্ত্রের সঙ্গে জুড়ে দিলেন। সাতের দশকে তৈরি হল আরও নির্ভরযোগ্য পেসমেকার, আর ব্যাটারির আয়ুও অনেকটা বাড়ল। এরপর নতুন নতুন বৈশিষ্ট্যযুক্ত পেসমেকার আবিষ্কৃত হতে লাগল, উদ্দেশ্য হল কৃত্রিম পেসমেকার যেন প্রাকৃতিক পেসমেকারের সব গুণগুলোই বজায় রাখতে পারে, বা আরও কিছু করতে পারে। সেই সব উন্নতি হয়েছে বলেই নানারকম পেসমেকার বাজারে এসেছে, আর আপনাকে পেসমেকার বেছে নিতে হচ্ছে। মনে করে দেখুন, আজ থেকে ত্রিশ বছর আগে আপনি কোন্ টেলিফোন কিনবেন সেটা নিয়ে ভাবতেন? আজ ভাবছেন— স্যামসাং না কি নোকিয়া, এমনি ফোন না কি স্মার্টফোন, এবং আরও কত কিছু, আর সেই মতো আলোচনা করছেন, নানা কিছু পড়ে জেনে নিচ্ছেন। পেসমেকারের উন্নতির একটা ফল হল আপনাকে ব্যাপারটা বুঝতে হবে, নয়তো আপনার প্রয়োজনীয় জিনিস ঠিকঠাক দামে আপনি পাবেন এমন সম্ভাবনা কম।

পেসমেকারের শ্রেণিবিভাগ

পেসমেকারের বৈশিষ্ট্য অনুসারে এর শ্রেণিবিভাগ করা হয় (mode, NBG Code)।[১] হৃদযন্ত্রের চার প্রকোষ্ঠ-দু'টো অলিন্দ ও দু'টো নিলয়। দেখা গেছে কেবল নিচের প্রকোষ্ঠ দু'টো, অর্থাৎ দু'টো নিলয় চালু করতে পারলেই প্রায় স্বাভাবিক রক্তপ্রবাহ চালু হয়। তাই অপেক্ষাকৃত সহজ প্রযুক্তির পেসমেকার দিয়ে নিলয় চালু করার পেসমেকারই (VVI) এতদিন পর্যন্ত বেশি ব্যবহার হয়ে এসেছে। এরপর যুক্ত হল এমন পেসমেকার যা প্রথমে দেখে নেয় নিলয়ে এবং / অথবা অলিন্দে তড়িৎপ্রবাহ ঠিকঠাক চলছে কি না, এবং তা না চললে নিলয়কে বাইরে থেকে তড়িত উত্তেজনা সরবরাহ করে। তারপর তৈরি হল নতুন পেসমেকার যা হৃদযন্ত্রে তড়িৎপ্রবাহ ঠিকঠাক না চললে প্রথমে অলিন্দকে, এবং তার ক্ষণমাত্র সময় পরে নিলয়কে তড়িৎ উত্তেজনা পাঠায়। তারপর

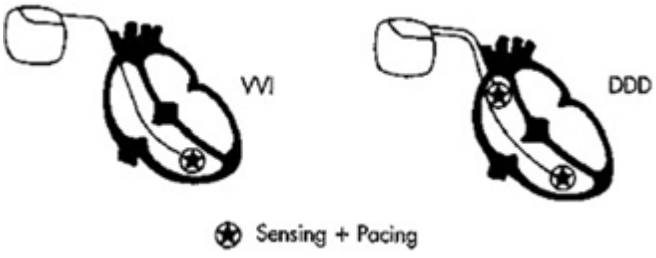

এল এমন পেসমেকার যা শারীরিক পরিশ্রমের মাত্রা অনুযায়ী হৃদস্পন্দনের হার কম বেশি করতে পারে, যেমনটা আমাদের প্রাকৃতিক পেসমেকার এস এ নোড করে থাকে। এই সব বৈশিষ্ট্য থাকা বা না থাকার ওপর নির্ভর করে ৮ থেকে ১০ শ্রেণির পেসমেকার তৈরি সম্ভব। এর মধ্যে VVI, VVIR, AAI, VDD, DDD, DDDR শ্রেণির পেসমেকারের প্রচলন আছে।

VVI পেসমেকার :

VVI পেসমেকারের কর্মপদ্ধতি প্রথম পর্বে (স্বাস্থ্যের বৃত্তে, আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০১৪) আলোচিত হয়েছে। কম কথায় বলতে গেলে, এটাই সরলতম পেসমেকার। কাঁধের নিচে চামড়ার তলায় এটা বসানো হয়। একটা মাত্র তড়িৎ প্রবাহী তার বা লীড এর থেকে বেরিয়ে শিরার মধ্যে দিয়ে যায় হৃদযন্ত্রের মধ্যে। সেখানে তারের অন্য প্রান্ত ডান দিকের নিলয়ের একদম নিচে খুব নির্ভরযোগ্য ভাবে আটকানো থাকে। ওই তার দিয়ে দিনরাত সব সময় প্রাকৃতিক পেসমেকারের (এস এ নোড) তৈরি তড়িৎ প্রবাহ নির্ণীত হতে থাকে, আর কৃত্রিম পেসমেকারের কাছে খবর যায়। যখন প্রাকৃতিক পেসমেকারের তৈরি তড়িৎ প্রবাহ ওই তারে এসে পৌঁছয় না, তখনই কৃত্রিম পেসমেকারের উৎপন্ন তড়িৎ প্রবাহ চালু হয়। সেটা ডান নিলয়কে তড়িৎ উত্তেজনা সরবরাহ করে। তাতে কাজ চলে যায়, কিন্তু সেটা সব সময় একই হারে হৃদস্পন্দন চালু রাখে, প্রয়োজনমাফিক কম বেশি হয় না। আবার যখন প্রাকৃতিক পেসমেকারের তৈরি তড়িৎ প্রবাহ শুরু হয়, তখন তারের মাধ্যমে কৃত্রিম পেসমেকারের কাছে খবর যায়, আর তার কাজ তখন বন্ধ হয়ে যায়। VVIR শ্রেণির পেসমেকারের বৈশিষ্ট্য এমনিতে VVI পেসমেকারের মতো একই রকম, কিন্তু VVIR পেসমেকার শরীরের চাহিদা অনুযায়ী হৃদস্পন্দন-হার বাড়াতে কমাতে সক্ষম—শারীরিক পরিশ্রমের সময় VVIR পেসমেকার হৃদস্পন্দন-হার বাড়িয়ে দেয়।

এই ব্যাপারটা বুঝতে গেলে স্বাভাবিক হৃদস্পন্দনের ব্যাপারটা একবার ঝালিয়ে নেওয়া দরকার। সুস্থ হৃদযন্ত্রে ডান অলিন্দের ওপর সাইনো-এট্রিয়াল নোড বা এস এ নোড থেকে প্রাকৃতিক তড়িৎ উত্তেজনা তৈরি হয়। সেই তড়িৎ অলিন্দ বেয়ে নেমে আসা বিশেষ তড়িৎ-পরিবাহী তন্তুর (হিজ বান্ডল) মাধ্যমে প্রথমে অলিন্দের পেশিতে ও তার ক্ষণমাত্র পর নিলয়ের পেশিতে তড়িৎ-প্রবাহ পাঠায়। পেশিগুলো সেই মতো পর্যায়ক্রমে সঙ্কুচিত হয়—প্রথমে অলিন্দের সঙ্কোচন ও তার ঠিক পরেই নিলয়ের সঙ্কোচন। তড়িৎ-প্রবাহ চলে যাওয়ার পরে পেশিগুলো তাদের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে, অর্থাৎ প্রসারিত হয়। সঙ্কোচন প্রসারণের গোটা ব্যাপারটা ঘটতে সময় লাগে খুব কম, স্বাভাবিক গতিতে চলমান হৃদযন্ত্রের ক্ষেত্রেও এই সময় এক সেকেন্ডের কম, হৃদস্পন্দন দ্রুত হলে (যেমন ব্যায়ামের সময় বা জ্বরের সময়) এই সময় আরও কমে যায়।

প্রাকৃতিক তড়িৎ-উত্তেজনা তৈরি হওয়া বা হৃদপেশিতে ঠিকঠাক পৌঁছানোর ব্যাপারটা না হলে আমরা বলি 'হার্ট ব্লক' হয়েছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সাইনো-এট্রিয়াল নোড থেকে তড়িৎ-উত্তেজনা তৈরি হয় না, এবং/ অথবা তড়িৎ-পরিবাহী তন্তুর (হিজ বান্ডল) কোনও অংশ তড়িৎ পরিবহনে অক্ষম হয়ে পড়ে। তখন কৃত্রিম উপায়ে (অর্থাৎ কৃত্রিম পেসমেকারের সাহায্যে) কেবল নিলয়কে তড়িৎ-উত্তেজনা পাঠালেই কাজ চলে যায়, তবে স্বাভাবিক

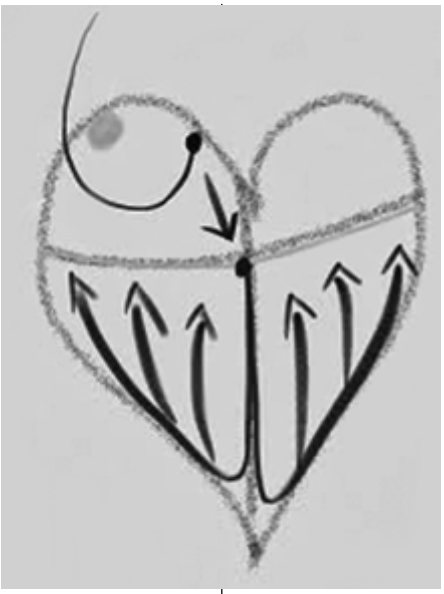

হৃদস্পন্দনের মতো পর্যায়ক্রমে প্রথমে অলিন্দ ও তার ক্ষণমাত্র পরে নিলয়ে তড়িৎ-প্রবাহ পাঠাতে পারলে তো আরও ভাল। VVI পেসমেকার একটা আপস করে— সেটা কেবল নিলয়কে তড়িৎ-উত্তেজনা পাঠায় কিন্তু তা বলে তাকে কমা ভাবলে ভুল হবে। এই ধরনের পেসমেকার এ তাবৎ সবচেয়ে ব্যবহৃত, আর তাই সব চেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য, যান্ত্রিক ত্রুটি হওয়ার সম্ভাবনা সব থেকে কম। ব্যাটারির আয়ু সব চেয়ে বেশি, ফলে ব্যাটারি বদলানোর জন্য ছোট অপারেশনটা করার ঝক্কি সব চেয়ে কম বার নিতে হয়। যে সব রোগীর প্রাকৃতিক পেসমেকার তেমন ভয়ানকভাবে খারাপ হয়নি, তাঁদের জন্য এটা বেশ সুবিধাজনক। এবং এর দামও সব চেয়ে কম। তত্ত্বগত ভাবে এই পেসমেকারে দু'ধরনের সমস্যা হওয়া সম্ভব। প্রথমে অলিন্দের সঙ্কোচন ও তার ঠিক পরেই নিলয়ের সঙ্কোচন—এই ব্যাপারটা ঠিকঠাক হয় না, ফলে হৃদযন্ত্রের পাম্প করার ক্ষমতা খানিক কমে যেতে পারে। এবং দুর্বল হৃদপেশির রোগীর ক্ষেত্রে এটা সমস্যা করতে পারে। এ ছাড়া স্বাভাবিক নিলয় সঙ্কোচন ঘটে তড়িৎ-পরিবাহী তন্তুর (হিজ বান্ডল) সরবরাহ করা তড়িতের সাহায্যে — তার প্রবাহ যে দিকে, VVI পেসমেকারের তৈরি তড়িৎ-প্রবাহ প্রায় তার বিপরীত দিকে। ফলে হৃদছন্দ পতন (Cardiac Arrythmia) ঘটতে পারে, যেখানে অলিন্দ এবং / অথবা নিলয় এলোমেলোভাবে সঙ্কুচিত-প্রসারিত হয়, ও শরীরে রক্ত ঠিকঠাক পৌঁছয় না। এটা বিপজ্জনক ব্যাপার। অলিন্দের ফিব্রিলেশন নামক হৃদছন্দ পতন ও 'পেসমেকার সিনড্রোম' নামক লক্ষণসমষ্টি — VVI পেসমেকার ব্যবহারে এ দুটো হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

AAI পেসমেকার :

এই শ্রেণির পেসমেকারে তড়িৎ-উত্তেজনা ডান অলিন্দে, স্বাভাবিক তড়িৎ-উত্তেজনা সৃষ্টির জায়গাতেই সরবরাহ করা হয়, আর তড়িৎ প্রবাহ স্বাভাবিক পথ ধরে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে স্বাভাবিক ভাবে যেমন হতো, সে রকম ভাবে প্রথমে অলিন্দ ও তারপর নিলয় সঙ্কুচিত-প্রসারিত হয়। হৃদযন্ত্রের পাম্প করার ক্ষমতা কমে যাওয়া, অলিন্দের ফিব্রিলেশন নামক হৃদছন্দ পতন ও 'পেসমেকার সিনড্রোম' — VVI পেসমেকারের এই সব সমস্যাগুলো AAI পেসমেকারে নেই। কিন্তু সবার জন্য এই পেসমেকার কাজের নয়। যাদের এস এ নোডে সমস্যার ফলে স্বাভাবিক তড়িৎ-উত্তেজনা সৃষ্টি হচ্ছে না (সাইনাস নোডের অসুখ, সিক সাইনাস ডিনড্রোম), তাঁদের এই পেসমেকার দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু তড়িৎ-উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ার ব্যবস্থায় কোনও অসুবিধা থাকলে, বা সে রকম অসুবিধা ভবিষ্যতে হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে, তাঁদের AAI পেসমেকার দেওয়া যাবে না। কেন না সে ক্ষেত্রে এই AAI পেসমেকারে তৈরি হওয়া তড়িৎ-উত্তেজনা ঠিকঠাক তৈরি হলেও অলিন্দ ও নিলয়ে ঠিকঠাক পৌঁছবে না। ফলে পেসমেকার বসিয়েও কোনও লাভ হবে না। তাত্ত্বিক দিক থেকে এই AAI পেসমেকার খুব আকর্ষণীয় মনে হলেও এটা তেমন জনপ্রিয় হয়নি।

পেসমেকারের প্রয়োজন আছে এমন রোগীদের মধ্য সাইনাস নোডের অসুখই বেশি। কিন্তু তাঁদের মধ্যে ২০ শতাংশের তড়িৎ-উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ার ব্যবস্থায় অসুবিধা থাকে, বা পেসমেকার বসানোর পরে সে রকম অসুবিধা হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে। তখন আবার নিলয়কে আলাদা করে তড়িৎ-উত্তেজনা পাঠানোর জন্য অন্য পেসমেকার বসাতে হয়, আর সেটা বেশ অসুবিধাজনক।

DDD, DDDR শ্রেণির পেসমেকার :

আজকাল DDDR শ্রেণির পেসমেকার ব্যবহারের প্রবণতা বেশি দেখা যাচ্ছে। আগের বারের (স্বাস্থ্যের বৃত্তে, আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০১৪) আলোচনায় আমরা দেখেছি, পেসমেকার হৃদযন্ত্রের কোন্ প্রকোষ্ঠকে তড়িৎ-উত্তেজনা পাঠাবে, সেটা পেসমেকারের শ্রেণি-নামের প্রথম অক্ষর থেকে বোঝা যায়। DDDR-এর প্রথম D দিয়ে 'Dual' বা 'দুই' বোঝানো হয়। তার মানে এই শ্রেণির পেসমেকার অলিন্দ ও নিলয় (ডানদিকের) দুটোকেই আলাদা আলাদা করে তড়িৎ-উত্তেজনা পাঠাতে পারে। চামড়ার নীচে বসানো পেসমেকার

থেকে দুটো তড়িতবাহী তার শিরার মধ্যে দিয়ে ডান অলিন্দ ও ডান নিলয়ে যায়। DDDR-এর দ্বিতীয় D দিয়ে বোঝানো হয় যে পেসমেকার ডান অলিন্দ আর ডান নিলয়ে তড়িৎ-উত্তেজনার উপস্থিতি নির্ণয় করতে পারে। DDDR-এর তৃতীয় D দিয়ে 'Dual-inhibited or triggered' বোঝানো হয়। তার মানে হল, ডানদিকের অলিন্দ আর নিলয় দুই জায়গাতেই পেসমেকার স্বাভাবিক তড়িৎ-উত্তেজনার উপস্থিতি নির্ণয় করলে পেসমেকার নিজে আর কৃত্রিম তড়িৎ-উত্তেজনা পাঠাবে না, অথবা বিরল ক্ষেত্রে, একজায়গায় প্রাকৃতিক তড়িৎ-উত্তেজনা উপস্থিত থাকলেও পেসমেকার অতিরিক্ত তড়িৎ-উত্তেজনা পাঠাবে। DDDR-এর R দিয়ে বোঝানো হয় অন্য আর একটা বৈশিষ্ট্য। আমরা জানি, শারীরিক পরিশ্রমের সময় আমাদের হৃদস্পন্দনের হার বৃদ্ধি পায়। কিন্তু সাধারণভাবে কৃত্রিম পেসমেকার একটা পূর্ব-নির্ধারিত গতিতে চলে। পেসমেকারের শ্রেণিনামে R থাকলে বুঝতে হবে, সেটা শারীরিক পরিশ্রমের সময়ে হৃদস্পন্দনের হার বৃদ্ধি করতে সক্ষম। হৃদপেশির শ্রমজনিত কম্পনের মাত্রা অনুসারে এই পেসমেকারগুলো হৃদস্পন্দনের হার বাড়িয়ে দেয়।

VVI শ্রেণির তুলনায় DDD/DDDR শ্রেণির পেসমেকারের দাম তিনগুণ, আর ব্যাটারির আয়ু অর্ধেক। সেটা মেনে নিলে কয়েকটা সুবিধা পাবার কথা। প্রথমত, যেহেতু DDDR (বা DDD) শ্রেণির পেসমেকারে প্রথমে অলিন্দ আর তারপর নিলয় পর্যায়ক্রমে সঙ্কুচিত-প্রসারিত হয়, সেহেতু অলিন্দ সঙ্কোচনের পুরো সুবিধাটা পাওয়া যায়। পেসমেকার যাঁদের লাগে, তাঁদের অধিকাংশের হৃদপেশির কর্মক্ষমতা কম, তাঁদের ক্ষেত্রে হৃদযন্ত্র এই সুবিধা পেলে ২০ শতাংশ অধিক রক্ত পাম্প করতে পারে, এবং এটা নেহাত ফেলনা ব্যাপার নায়। দ্বিতীয়ত, অলিন্দ এবং নিলয়, দু' জায়গাতেই পেসমেকারের তড়িৎ-উত্তেজনা সৃষ্টি করার ক্ষমতা থাকলেও, কোনও একজন রোগীর ক্ষেত্রে হয়ত হার্ট ব্লকের সমস্যা অধিকাংশ সময় অলিন্দে সীমাবদ্ধ থাকে; তখন DDD/DDDR শ্রেণির পেসমেকার কেবল অলিন্দকেই উত্তেজিত করে। সেই উত্তেজনা স্বাভাবিকভাবেই নিলয়ে পৌঁছে যায়; তখন নিলয়ের কৃত্রিম উত্তেজনা সৃষ্টি হয় না। অপ্রয়োজনে নিলয়ের উত্তেজনা কমানোর সুফল দুটো। ব্যাটারির আয়ু বাড়া, এবং পেসমেকার জনিত রোগ, যাদের কথা আগেই বলেছি, সেগুলো কমা।

কিন্তু এ সব তত্ত্বকথা, এগুলো প্রমাণ করতে বিস্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণা দরকার। এখনও পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা এই সব সুফলের ব্যাপারে একমত হতে পারেননি। পরীক্ষাগারে কিছু কিছু সুফলের আভাস (surrogate markers) পাওয়া গেলেও অন্তিম পরীক্ষা হিসেবে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর ওপর সমীক্ষায় ধারাবাহিক সুফল লাভ করা যায়নি (CTOPP 2000, MOST 2002, UKPACE 2002, RAMP 1999, ADEPT 2002)।[২]

কিন্তু কেন DDD/DDDR শ্রেণির পেসমেকারগুলো এই সুফল দেখাতে পারছে না? যতদূর বোঝা গেছে, স্বাভাবিক ভাবে হৃদযন্ত্রের সঙ্কোচনের সময় পুরো নিলয়ের সমস্ত মাংসপেশি এক সঙ্গে সঙ্কুচিত হয়, সেটা কোনও কৃত্রিম পেসমেকারেই সম্ভব হচ্ছে না। স্বাভাবিক নিলয় সঙ্কোচনের ক্ষেত্রে, তড়িৎ প্রবাহ প্রথমে দুই নিলয়ের মধ্যবর্তী দেওয়ালকে উত্তেজিত করে, তার পর বিশেষ তড়িৎ-পরিবাহী তন্তুর (হিজ বান্ডল)-এর মাধ্যমে উত্তেজনা খুব দ্রুত দুটো নিলয়ে ছড়িয়ে যায়, এবং নিলয় দুটোর সমস্ত মাংসপেশি এক সঙ্গে সঙ্কুচিত হয়। তার ফলে ডিম্বাকৃতি নিলয়ের ভেতরের গহ্বর একেবারে অনেকটা ছোট হয়ে যায়, আর নিলয়ের প্রায় সমস্ত রক্তই ধমনী দিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। কৃত্রিম পেসমেকারের ডান নিলয়ে প্রোথিত তড়িৎ উত্তেজনা সৃষ্টির যন্ত্র বিশেষ তড়িৎ-পরিবাহী তন্তুর (হিজ বান্ডল)-এর মাধ্যমে ছড়ায় না, তা নিলয়ের নীচের দিক থেকে ওপর দিকে অপেক্ষাকৃত ধীর গতিতে ছড়ায়। ফলে নিলয় দুটোর সমস্ত মাংসপেশি এক সঙ্গে সঙ্কুচিত হয় না, খানিক আগে পরে হয়ে যায়। তার ফলে নিলয়ের ভেতরের গহ্বর একেবারে অনেকটা ছোট হয়ে সমস্ত রক্ত এক সঙ্গে বের করে দিতে পারে না। বা অন্য কথায়, হৃদযন্ত্র কম রক্ত পাম্প করতে পারে। এটা কৃত্রিম পেসমেকারের উন্নতির সামনে এক কারিগরি সঙ্কট। একে কী ভাবে কাটিয়ে ওঠা যাবে তার কোনও দিশা এখনও নেই।

শুধু হার্ট ব্লক নয়, কোনও দীর্ঘমেয়াদী জটিল হৃদরোগের শেষ অবস্থায় হৃদপেশির শক্তি পাকাপাকি ভাবে কমে গেলে (ক্রনিক হার্ট ফেইলিওর), ওষুধে ভাল কাজ না হলে পেসমেকার বসাতে হয়। এ সব ক্ষেত্রে দুই নিলয়ের জন্য দুটো আলাদা তড়িৎবাহী তার (pacing lead) বসানো হয় (biventricular pacing)।

কোন শ্রেণির পেসমেকার বসাবেন ?

কঠিন প্রশ্ন, কিন্তু এটার জবাব পাওয়ার জন্যই তো এতটা এগিয়েছি। পেসমেকার নির্বাচনের কোনও চটজলদি টোটকা পদ্ধতি নেই। রোগীর হার্ট ব্লকের ধরন, হৃদযন্ত্রে অতিরিক্ত কোনও রোগ আছে কি না, কোন কোন পেসমেকার পাওয়া যাচ্ছে ও তাদের নির্মাতার বিক্রয়-পরবর্তী পরিষেবা, চিকিৎসকের অভিজ্ঞতা ও কোন পেসমেকারে তিনি বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করেন, রোগীর পেসমেকার ব্যবহারের হার, তাঁর আর্থিক সঙ্গতি-এ সমস্তই বিচার করতে হবে। প্রত্যেক রোগীর ক্ষেত্রে ব্যাপারগুলো আলাদা আলাদা করে বুঝে নিতে হবে। তবে মোটামুটি একটা রূপরেখা দেওয়া সম্ভব, এবং পরের চার্টে সেই রূপরেখা দেওয়া হল।

রোগীকে সবার আগে নিজের প্রয়োজনটা ঠিক মতো বুঝে নিতে হবে। বাজারের একটা শক্তি আছে, সেটার ঊর্ধ্বে উঠতে হবে— সব চেয়ে দামি পেসমেকারটাই একজনের পক্ষে সব চেয়ে ভাল, এমন নয়। অনেকের হার্ট ব্লক কেবল মাঝে মধ্যে ক্ষণিকের জন্য দেখা দেবে, তাঁর পেসমেকার প্রায় সব সময় কেবল স্বাভাবিক হৃদস্পন্দন আছে কি নেই সেটা ধরতে কাজে আসবে---- এ সব ক্ষেত্রে সহজ প্রযুক্তির কম দামের VVI শ্রেণির পেসমেকারই সঠিক।

পেসমেকারের শ্রেণি বাছার জন্য উন্নত দেশের নির্দেশিকা অন্ধভাবে মেনে চলার ব্যাপারে বিতর্ক আছে। বেশি বৈশিষ্ট্যযুক্ত পেসমেকার সবার জন্যই ভাল, এই মতবাদের প্রবক্তারা বলেন 'জীবনের মান' ভাল করার জন্য বেশি বৈশিষ্ট্যযুক্ত পেসমেকার লাগাতে হবে। মুশকিল হল, 'জীবনের মান' বিশ্বাসযোগ্য ভাবে মাপা দুরূহ, আর তার দোহাই দিয়ে VVI শ্রেণির বদলে DDD/DDDR শ্রেণির পেসমেকার বসানো মেনে নেওয়া শক্ত। এই বিষয়ে শেষ কথা বলার সময় এখনও আসেনি। যে সব চিকিৎসা অনুসন্ধান চালানো হয়েছে, তাদের অনেকগুলোই পেসমেকার নির্মাতা কোম্পানির পয়সা পেয়েছে।

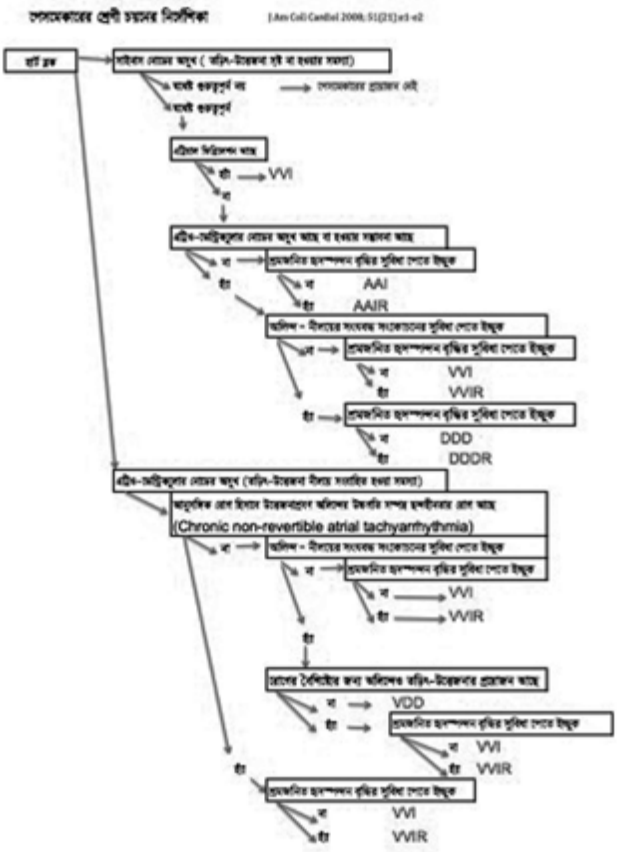

ব্রিটিশ হার্ট ফাউন্ডেশনের আর্থিক অনুদানে চালানো এক অনুসন্ধানে বলা হয়েছে, পেসমেকার বসানোর ফলে 'জীবনের মান'-এর উন্নতি হয়, কিন্তু দু'বছর পরে সেটা আবার পেসমেকার বসানোর আগের অবস্থায় ফিরে যায়। আর কোন্ শ্রেণির পেসমেকার বসানো হল, তার জন্য 'জীবনের মান'-এর উন্নতি বেশি দিন বা কম দিন স্থায়ী হয় না। বরং আনুষঙ্গিক রোগ হিসেবে হার্টের রক্তনালীর সরু হয়ে যাবার রোগ আছে কি না, থাকলে সেটা কতটা বেশি, তার ওপর 'জীবনের মান'-এর উন্নতি স্থায়িত্ব নির্ভর করে।[৪]

পেসমেকারের শ্রেণি নির্বাচনের নির্দেশিকা :

হার্ট ব্লকের সমস্যা কেবল মাঝে মধ্যে ক্ষণিকের জন্য হলে সাধারণ ও কমদামী VVI শ্রেণির পেসমেকারই যথাযথ। যাঁদের অলিন্দের ফিব্রিলেশন (এক অনিয়ন্ত্রিত হৃদছন্দ-পতন রোগ) এর সঙ্গে নিলয়ের ধীর গতির স্পন্দনের রোগ আছে, তাঁদেরও VVI শ্রেণির পেসমেকার প্রয়োজন। বেশি বয়সের রোগী, বা যাঁদের অন্য মারাত্মক রোগের জন্য বেশিদিন বাঁচার সম্ভাবনা কম, তাঁদের জন্যও VVI পেসমেকার বসানো উচিত। আবার শারীরিক প্রতিবন্ধকতার কারণে যদি কারও দুটো প্রকোষ্ঠে তার বসানোর অপেক্ষাকৃত জটিল পদ্ধতি ও বারবার ব্যাটারি বদলানোর ঝক্কি নেওয়া (DDD/DDDR শ্রেণির পেসমেকারে যেটা করতে হয়) অসুবিধা থাকে তবে সেখানেও VVI পেসমেকার প্রয়োজন। ন্যূনতম বৈশিষ্ট্যযুক্ত ও কমদামী VVI শ্রেণির পেসমেকার সব ধরনের হার্ট ব্লকেই নির্ভরযোগ্যভাবে কাজ করে, অন্য শ্রেণির পেসমেকারগুলো বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে খানিক অতিরিক্ত সুবিধা (যেমন শারীরিক পরিশ্রমের সময় হৃদস্পন্দন হার বাড়ানো) দেয়।

আগেই বলেছি, হার্ট ব্লকের সমস্যা কেবল মাঝে মধ্যে ক্ষণিকের জন্য হলে ন্যূনতম বৈশিষ্ট্যযুক্ত ও কমদামী VVI শ্রেণির পেসমেকারই যথাযথ। অন্য ক্ষেত্রে, যেখানে পেসমেকারকে বেশি কাজ করতে হবে, সেখানে বেশি বৈশিষ্ট্যযুক্ত পেসমেকারের সুবিধার সঙ্গে সঙ্গে তার খরচের বহর ও ব্যাটারি বদলের ঝামেলার ব্যাপারে রোগী বা তাঁর পরিবারের সঙ্গে সরাসরি ও খোলাখুলি আলোচনা করে নেওয়া উচিত।

প্রতি রোগীরই কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকে। তাই কঠোর নির্দেশিকা নয়, পেসমেকারের শ্রেণি নির্বাচনের এক রূপরেখাই কেবল দেওয়া অসম্ভব।

সূত্র :

1. http://www.pacemaker.vuurwerk.nl/info/nbg_code _naspe.htm
2. Lamas GA, et al. Ventricular pacing or dual-chamber pacing for sinus-node dysfunction. N Engl J Med 2002; 346 : 1856-1862.
3. Nielsen JC, et al. A comparison of single-lead atrial pacing with dual-chamber pacing in sick sinus syndrome. Eur Heart J 2011 : 32 : 686-696.
4. G.M. Gribbin, R.A. Kenny, P. McCue, W.D. Toff, R.S. Bexton, J.M. McComb-Individualised quality of life after pacing. Does mode matter? - doi:10.1016 / j.eupc.2004.07.011).

লেখক পরিচিতি : ডা. গৌতম মিস্ত্রী, এমবিবিএস, এমডি, ডিএম, একজন কার্ডিওলজিস্ট, প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন।

advt.

এখন **দুর্বার ভাবনা** পাওয়া যাচ্ছে

শিলিগুড়িতে বুকস, কুচবিহারে পার্থ লাহিড়ী, এন এইচ রোড, নবদ্বীপের পোড়ামাতলায় সুজয়া প্রকাশনী, পশ্চিম মেদিনীপুরের ভূর্জপত্র (বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি রোড), শান্তিনিকেতনে সুবর্ণরেখা।

কলকাতায় : হাওড়া স্টেশন (কলকাতা বাসস্ট্যান্ড, হাওড়া বাসস্ট্যান্ড), শিয়ালদহ স্টেশন (সানশাইন বুকস্টল, রামকৃষ্ণ পুস্তকালয় ও অন্যত্র), কলেজ স্ট্রিট (পাতিরাম, বুকমার্ক, মণীষা গ্রন্থালয়, বইচিত্র ও অন্যত্র)।

রাসবিহারী মোড়, ফুলবাগান (বেলেঘাটা), হাতিবাগান, শ্যামবাজার (পাঁচমাথার মোড়), ঢাকুরিয়া (দক্ষিণাপণের বিপরীতে), বইকল্প (দোতলায়), বিধাননগর (উল্টোডাঙা) স্টেশন ও অন্যত্র।

যাঁরা পত্রিকার এজেন্সি নিতে চান এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন— ১২/৫ নীলমণি মিত্র স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৬।

অথবা ফোন করুন ০৯৬৭৪ ১৬২০৯৪ অথবা ০৩৩ ২৫৪৩ ৭৫৬০।

জিন-এর ‘সম্ভাবনা’ এবং অ-‘সম্ভাবনা’ : আজকের সময়ের একটা পুনর্মূল্যায়ন

পর্ব তিন

ডিজাইনার বেবি, লিবারাল ইউজেনিকস, এবং কিছু আশঙ্কা

ডা. সুমিত্রন বসু

[**আগের সংখ্যায় যা পড়েছি :** জিনগত রোগ মানেই বংশগত রোগ, কিংবা শরীরে নতুন জিন বিকৃতি (মিউটেশন)-এর ফলে উৎপন্ন রোগ। জেনেটিক নানা রোগ আছে, যেগুলো মানব-প্রজাতির সুদীর্ঘ ইতিহাসে এক সময় মানুষের বেঁচে থাকার সহায়ক হয়ে উঠেছিল; এমনই একটা রোগ হল সিকল সেল অ্যানিমিয়া। আবার আজ যা ডায়াবেটিসের জেনেটিক প্রবণতা, এক দিন তা আদিম মানুষকে খিদের সময় বাঁচিয়ে রেখেছিল। তাই জিন নিয়ে কোনও সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন করার আগে ভাবা দরকার, প্রায় কোনও সহজপ্রাপ্য জিনই আলাদা করে ভাল নয়, খারাপও নয়; সেগুলো একটা বিশেষ পরিবেশের সাপেক্ষে ভাল বা খারাপ—এই মাত্র।]

আমরা আগের সংখ্যায় (*স্বাস্থ্যের বৃত্তে*, আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০১৪) দেখেছি, ‘প্রাক-গর্ভাধান জিন-ঘটিত রোগ নির্ণয়’ (Pre-implantation Genetic Diagnosis / Screening, বা সংক্ষেপে, PGD/S) হল এমন একটা নতুন ধরনের পরীক্ষা যার মাধ্যমে মাতৃগর্ভে একটা সদ্যগঠিত ভ্রূণের মধ্যে প্রতিটি ডিএনএ-কে পরীক্ষা করে বলে দেওয়া যায় যে সেগুলোর ভেতরে কোনও বিশেষ ত্রুটিযুক্ত জিন রয়েছে কি না। এই পরীক্ষার ফলে জন্মের পূর্বেই জানা যায় যে বড় হলে সেই শিশুর মধ্যে কোনও মারাত্মক বা জীবনহানিকর জিন-ঘটিত রোগ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে কি না। কিছু কিছু ‘এক জিন ঘটিত রোগ’ নিবারণের জন্য এই পরীক্ষা এখন খুব কাজে লাগে। এই পরীক্ষার জন্য ‘কৃত্রিম গর্ভাধান’ (In vitro fertilization, বা সংক্ষেপে, IVF) করা দরকার। ‘কৃত্রিম গর্ভাধান’-এর সাহায্যে অনেকগুলো সদ্যগঠিত ভ্রূণ এক সঙ্গে সৃষ্টি করা হয়। যদি কোনও একটা ভ্রূণে PGD/S-এর সাহায্যে কোনও মারাত্মক ত্রুটি নির্ণয় করা যায় তা হলে সেই ভ্রূণটিকে বাতিল করে অন্য আরেকটা ভ্রূণের ওপর একই পরীক্ষা চালানো হয়। যে ভ্রূণটার মধ্যে সেই বিশেষ জিন সম্পর্কিত ত্রুটি পাওয়া যাবে না, সেই ভ্রূণটাকেই মায়ের গর্ভে প্রতিস্থাপন করা হবে। সিকল সেল অ্যানিমিয়া জাতীয় রোগ হল এক জিন ঘটিত রোগ। মা কিংবা বাবা যদি এমন কোনও এক জিন ঘটিত রোগে ভোগেন, বা তার বাহক হন, এক মাত্র সেই ধরনের রোগের ক্ষেত্রে PGD পরীক্ষাটার মাধ্যমে ভ্রূণটার ভবিষ্যতে সেই রোগ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে কি না তা মোটামুটি ভাবে নিশ্চিত করে বলা যায়। কিন্তু এই রকম এক জিন সম্বন্ধীয় বংশগত রোগের সংখ্যা কিন্তু তুলনামূলকভাবে অনেক কম। এদের মধ্যে চেনা রোগগুলো হল বিটা থ্যালাসেমিয়া (beta-thalassaemia), সিকল সেল অ্যানিমিয়া (sickle cell anaemia), সিস্টিক ফাইব্রোসিস (cystic fibrosis) ইত্যাদি। কিন্তু অধিকাংশ জেনেটিক রোগের জন্য দায়ী হল একাধিক জিন। সেই সব ক্ষেত্রে ‘প্রাক-গর্ভাধান জিন-ঘটিত রোগ নির্ণয়’ ও তার পরে ‘কৃত্রিম গর্ভাধান’ — এই পদ্ধতিতে বংশগত রোগ এড়ানো অনেক শক্ত, এখনও প্রায় অসম্ভব। কিন্তু আমার কথা আপাতত সেটা নিয়ে নয়।

এক জিন সম্বন্ধীয় বংশগত রোগের সংখ্যা কিন্তু তুলনামূলকভাবে অনেক কম।

স্বাভাবিকের ওপর কারিকুরি

ধরা যাক, এই PGD/S পরীক্ষাটার প্রয়োগের পরিসর আরেকটু বাড়িয়ে নেওয়া যেতে পারে। তখন এর মাধ্যমে শুধু মাত্র ত্রুটিযুক্ত (Pathological) জিনসমূহের সনাক্তকরণই নয়, তার সঙ্গে স্বাভাবিক (Non-pathological) জিনগুলোকে চিহ্নিত করা যেতে পারে। এবং এই স্বাভাবিক জিনগুলোর চরিত্রের ওপর ভিত্তি করে একটা বিশেষ ভ্রূণকে বেছে নেওয়া যেতে পারে।

অর্থাৎ আইভিএফ পদ্ধতিতে একাধিক ভ্রূণ তৈরি করা হল। তার মধ্যে একটা ভ্রূণের কোনও বিশেষ গুণ (ধরুন ফর্সা রং) তৈরি করার মতো জিন অন্য ভ্রূণের চেয়ে বেশি আছে, এটা দেখে নেওয়া হল (উন্নততর PGD/S পদ্ধতির সাহায্যে)। তারপর সেই ভ্রূণটাকে বেছে নেওয়া হল। একটু টেকনিক্যাল ভাষায় বলতে গেলে, জিনের গুণের ওপর ভিত্তি করে কিছু ভ্রূণের মধ্যে থেকে একটাকে মনোনয়নের অগ্রাধিকার দিয়ে ‘উন্নতি’ করার প্রচেষ্টা—এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় ‘জিন সম্পর্কিত পরোক্ষ উন্নতিকরণ’ (Passive Genetic Enhancement, বা, PGE)। মানুষের যে সমস্ত বৈশিষ্ট্যের বিভিন্ন ‘স্বাভাবিক’ প্রকরণ বা বিভিন্নতা (Normal variations) রয়েছে তাদের মধ্যে থেকে কোনও বিশেষ একটা বা একাধিক গুণ বা ‘প্রকার’ মাতা-পিতা তাদের সন্তানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে চাইলেন। যেমন কোনও দম্পতির অভিলাষ থাকতেই পারে যে তাঁদের একটা ফর্সা, লম্বা, নীল চোখের এবং সোনালি চুলের মেয়ে জন্মগ্রহণ করুক।

- ‘প্রাক-গর্ভাধান জিন-ঘটিত রোগ নির্ণয়’ বা সংক্ষেপে, PGD/S পরীক্ষার মাধ্যমে মাতৃগর্ভে একটা সদ্যগঠিত ভ্রূণের ডিএনএ পরীক্ষা করে তার ত্রুটিযুক্ত জিন ধরা যায়।
- ‘কৃত্রিম গর্ভাধান’ বা সংক্ষেপে, IVF-এর সাহায্যে অনেকগুলো সদ্যগঠিত ভ্রূণ এক সঙ্গে সৃষ্টি করে ত্রুটিযুক্ত ভ্রূণগুলো বাতিল করে ত্রুটিহীন ভ্রূণকে মায়ের গর্ভে প্রতিস্থাপন করা হয়।
- এক জিন ঘটিত রোগের ক্ষেত্রে PGD/S পরীক্ষার মাধ্যমে ভ্রূণর ত্রুটিযুক্ত জিন ধরা ও IVF-এর সাহায্যে ত্রুটিযুক্ত ভ্রূণ বাতিল করা এখন সম্ভব।
- এক জিন ঘটিত রোগের চাইতে একাধিক জিন ঘটিত বংশগত রোগের সংখ্যা বেশি, কিন্তু এ সব রোগে PGD/S পরীক্ষা ও তারপর IVF-এর সাহায্যে ত্রুটিযুক্ত ভ্রূণ বাতিল করা এখনও প্রায় অসম্ভব।
- PGD/S পরীক্ষায় স্বাভাবিক জিনগুলোকেও চিহ্নিত করে, তাদের চরিত্রের ওপর ভিত্তি করে একটা বিশেষ ভ্রূণকে বেছে নিয়ে PGD/S পদ্ধতিতে বিশেষ গুণযুক্ত শিশু পাওয়া তাত্ত্বিকভাবে অসম্ভব নয়।
- এমন কী, ভ্রূণের জিন বাদ দিয়ে, অন্য মানুষের জিন সেখানে ঢুকিয়ে, একটা শিশুকে ইচ্ছেমতো নানা ‘জেনেটিক গুণ’-এর আধার করে বানানো সম্ভব। সেই শিশুর পপুলার নাম ‘ডিজাইনার বেবি’।
- কিন্তু বহু জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নানা দৈহিক বৈশিষ্ট্য ‘ডিজাইনার বেবি’-তে প্রকাশ কতটা পাবে তাই নিয়েই সন্দেহ আছে।
- কেবল জিন প্রতিস্থাপন করে মেধা, সঙ্গীতের দক্ষতা ইত্যাদি জটিল মনস্তাত্ত্বিক গুণ শিশুর মধ্যে সঞ্চারণ করা বর্তমান প্রযুক্তিতে সম্ভব নয়।
- জটিল মনস্তাত্ত্বিক গুণগুলো জিন-জিন মিথস্ক্রিয়া ও জিন-পরিবেশ মিথস্ক্রিয়ার ওপর নির্ভর করে, তা বর্তমান প্রযুক্তি, বা বর্তমানে ধারণা করা যায় এমন কোনও প্রযুক্তির আওতার মধ্যে নয়।
- ‘ইতিবাচক ইউজেনিকস’ দাঁড়িয়ে আছে বা মা-বাবার ইচ্ছেমতো দৈহিক ও মনস্তাত্ত্বিক গুণযুক্ত ‘ডিজাইনার বেবি’ তৈরি করার ধারণার ওপর।
- তা কোনও দিন সম্ভব হলেও, সেই প্রযুক্তি কিনতে পারবেন ধনীরাই। ফলে সামাজিক ও আর্থিক বৈষম্যের সঙ্গে জেনেটিক বৈষম্যযুক্ত হবে। সেটা কোনও মতেই কাম্য নয়।

তাঁরা বিভিন্ন স্বাভাবিক গুণাবলীর মধ্যে কয়েকটাকে পছন্দ করলেন, এবং সেগুলো বিজ্ঞানের সাহায্যে তাঁদের সন্তানের মধ্যে পূর্ব নির্ধারিত করতে চাইলেন — চামড়ার রঙের বিভিন্ন ‘স্বাভাবিক’ প্রকারের মধ্যে ‘ফর্সা’ রং পূর্ব নির্ধারিত করা, উচ্চতার বিভিন্ন ‘স্বাভাবিক’ প্রকারের মধ্যে দীর্ঘ উচ্চতা পূর্ব নির্ধারিত করা, লিঙ্গ হিসেবে স্ত্রী-লিঙ্গ পূর্ব নির্ধারিত করা ইত্যাদি। কৃত্রিম ভাবে, PGD/S-র মাধ্যমে বিভিন্ন ভ্রূণগুলোর ওপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখা হল যে কোন বিশেষ ভ্রূণটার ডিএনএ-এর মধ্যে মাতা-পিতার কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যযুক্ত জিনগুলো উপস্থিত। সেই ভ্রূণটাকেই মায়ের গর্ভে প্রতিস্থাপন করা হবে।

বর্তমানের প্রযুক্তি যত দূর অবধি অগ্রসর হয়েছে তার ভিত্তিতে কয়েকটা সরল এক-জিন সম্বন্ধীয় বৈশিষ্ট্য (Monogenetic trait) পূর্ব নির্ধারণ করা কিছু মাত্রায় সম্ভব হলেও তা কখনও নিঃশর্ত নিশ্চয়তা প্রদান করে না। অনেকে ভবিষ্যৎ-বাণী করছেন যে আগামী দিনগুলোতে শুধুমাত্র কয়েকটা সরল দৈহিক বৈশিষ্ট্যই নয়, আরও সূক্ষ্ম এবং জটিল মনস্তাত্ত্বিক নানা গুণের সঙ্গে যুক্ত জিনগুলো (যেমন মেধা, সঙ্গীতের দক্ষতা, স্মৃতিশক্তি ইত্যাদি) ভ্রূণের মধ্যে পূর্ব নির্ধারণ করা সম্ভব এবং সেই ভিত্তিতে সবচেয় সম্ভাবনাময় ভ্রূণ নির্বাচন করা সম্ভব।

কেউ কেউ আরও এগিয়ে গিয়ে বলছেন যে যদি উপরিউক্ত জিনগুলো ভ্রূণসমূহের মধ্যে না থাকে তা হলে যে সকল মানুষের কাছে সেই সব জিনগুলো রয়েছে, তার কোষ থেকে সেই কাঙ্ক্ষিত জিনগুলো নিষ্কাশিত করে, সেগুলোকে বিশেষ প্রযুক্তির (PCR প্রযুক্তি) মাধ্যমে সংখ্যায় বর্ধিত করে, তারপর তা ‘রিকমবিনেন্ট ডিএনএ প্রযুক্তি’-র মাধ্যমে আদি ভ্রূণকোষের নিজস্ব ডিএনএ-র মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে ফেলা সম্ভব। এবং এখান থেকেই উদ্ভব হয়েছে ‘পরিকল্পিত শিশু’ (Designer baby)-র ধারণাটা, যেখানে মাতা-পিতা তাদের সমস্ত কাঙ্ক্ষিত গুণগুলো তাদের শিশুর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে একটা সম্পূর্ণ ‘নিখুঁত শিশু’ কৃত্রিম ভাবে তৈরি করতে চান।

উদার বা ইতিবাচক সুপ্রজননবিদ্যা

আসলে এই ধারণাগুলো শুনতে নতুন হলেও এগুলো সবকটাই আসলে ‘উদার বা ইতিবাচক সুপ্রজননবিদ্যা’ (Liberal or Positive Eugenics)-এর অংশ। আমরা জানি যে চার্লস ডারউইনের খুড়তুতো ভাই ফ্রান্সিস গ্যালটনের হাত ধরে জন্ম নেওয়া সুপ্রজননবিদ্যা বিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েকটা দশক ধরে একটা নির্দিষ্ট মতাদর্শ হিসেবে জীববিজ্ঞানী, নৃতত্ত্ববিদ-সহ বৃহত্তর বৈজ্ঞানিক মহলে একটা সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। এক সময় বিজ্ঞানী মহলের গণ্ডি ছাড়িয়ে সুপ্রজননবিদ্যা বৃহত্তর জনমানসে সম্মতি লাভ করে একটা সামাজিক শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, সুইডেন সহ বহু রাষ্ট্রের সরকার এই মতবাদকে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি নীতি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল।

মনুষ্যজাতির কল্যাণ এবং উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে তার বিবর্তন প্রাকৃতিক নির্বাচনের খেয়ালখুশির ওপর নির্ভর না করে একটা সুপরিকল্পিত পথে অগ্রসর করা সম্ভব—জীববিজ্ঞানের এই ধারণা সুপ্রজননবিদ্যার মতাদর্শের মৌলিক ভিত্তি ছিল। ‘ইউজেনিকস’-এর প্রবক্তারা এই পথ বাতলেছিলেন যে জাতি বা সম্প্রদায়ের সদস্যদের বা এমনকী, যে ব্যক্তির মধ্যে কোনও তৎকালীন সামাজিক নৈতিকতা অনুযায়ী ‘অবাঞ্ছিত’ বা ‘অকাম্য’ সব চারিত্রিক, মানসিক বা শারীরিক বৈশিষ্ট্যসমূহ উপস্থিত থাকবে তাদের বাকি জনগণের থেকে বিচ্ছিন্ন (segregation) করতে হবে

অনেকে ভবিষ্যৎবাণী করছেন যে আগামী দিনগুলোতে শুধুমাত্র কয়েকটা সরল দৈহিক বৈশিষ্ট্যই নয়, আরও সূক্ষ্ম এবং জটিল মনস্তাত্ত্বিক নানা গুণের সঙ্গে যুক্ত জিনগুলো (যেমন মেধা, সঙ্গীতের দক্ষতা, স্মৃতিশক্তি ইত্যাদি) ভ্রূণের মধ্যে পূর্ব নির্ধারণ করা সম্ভব এবং সেই ভিত্তিতে সবচেয় সম্ভাবনাময় ভ্রূণ নির্বাচন করা সম্ভব।

এবং বাধ্যতামূলক ভাবে নির্বীজকরণ, গর্ভপাত, যন্ত্রণাহীন মৃত্যু ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের প্রজননের হার কমাতে হবে। এভাবেই মনুষ্যজাতির যে 'প্রজাতিক জিন ভাণ্ডার' রয়েছে সেখান থেকে অবাঞ্ছিত জিনগুলো আস্তে আস্তে বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং প্রজাতি হিসেবে মানুষের বিবর্তনে অগ্রগতি হবে। বহু ব্যক্তি ও গোষ্ঠী— যেমন মানসিক রোগী, দরিদ্র, প্রতিবন্ধী, 'চরিত্রহীনা' নারী, বারবনিতা থেকে সমকামী গোষ্ঠী থেকে কৃষ্ণাঙ্গ জাতি—সকলেই এই সরকারি নীতির দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন।

'পরিকল্পিত শিশু' (Designer baby)-র ধারণাটা, যেখানে মাতা-পিতা তাদের সমস্ত কাঙ্ক্ষিত গুণগুলো তাদের শিশুর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে সম্পূর্ণ 'নিখুঁত শিশু' কৃত্রিম ভাবে তৈরি করতে চান।

সুপ্রজননবিদ্যা ও নাৎসিবাদ

ইউজেনিকস একটা অন্য মাত্র লাভ করল গত শতকের ত্রিশের দশকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় 'আর্যরক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষা'-র উদ্দেশ্যে হিটলারের নেতৃত্বে নাৎসি জার্মানি ইহুদি, স্লাভ, কৃষ্ণাঙ্গ ইত্যাদি জাতির লক্ষ লক্ষ মানুষদের খুন করে গণ হত্যার মাধ্যমে এক একটা সমগ্র জাতির বিলোপসাধনের প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হল। তারপর থেকে 'ইউজেনিকস' এমন এক ঘৃণ্য শব্দে পরিণত হল যে বিজ্ঞানীমহলে এই শব্দটা এক রকম নিষিদ্ধ ছিল, এবং এখনও প্রায় তা-ই আছে। ইদানিং নতুন করে উদার বা ইতিবাচক ইউজেনিকস-এর ধারণা উঠে আসছে, আর সেখানে আগের ইউজেনিকস-এর সেই কলঙ্কিত ইতিহাস এবং ঐতিহ্য সচেতনভাবে দূরে রাখার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। এখন বলা হচ্ছে, অতীতে যা ছিল সেটা হল নেতিবাচক ইউজেনিকস। ইতিবাচক ইউজেনিকস-এর প্রবক্তারা বলছেন যে পূর্বের নেতিবাচক ইউজেনিকস কর্মসূচিতে মূল বিষয় ছিল একটা স্বৈরাচারী রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ইচ্ছের বিরুদ্ধে কোনও 'অক্ষম' ব্যক্তি বা জাতির প্রজননহার বলপূর্বক হ্রাস করা; অপরদিকে ইতিবাচক ইউজেনিকস-এর মূল বিষয় হল কোনও জাতি নয় বরং পরিবারের স্তরে, কোনও সরকারি নির্দেশে নয় বরং ব্যক্তি মাতাপিতার স্বেচ্ছা-স্বাধীনতায় নতুন ধরনের প্রজনন ও জিন-প্রযুক্তির মাধ্যমে (যেমন IVF, PGD/S ইত্যাদি) তাঁদের নির্বাচিত কোনও শারীরিক বা মানসিক বৈশিষ্ট্য একটা প্রজন্ম থেকে পরের প্রজন্মে বাহিত করা, যার মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের মধ্যে সেই বৈশিষ্ট্যগুলো উন্নতি লাভ করে। এক্ষেত্রে ব্যক্তি বা পরিবার হল এই উন্নত প্রযুক্তির ক্রেতা এবং ভক্ত, আর তাঁরা সরকারি বা বেসরকারি সংস্থার কাছ থেকে প্রযুক্তিটা ক্রয় করছেন তাঁদের পছন্দমতো সন্তান তৈরি করার উদ্দেশ্যে। লিবারাল ইউজেনিকস-এর অন্যতম প্রবক্তা ফ্রেডরিক অসবোর্ন 'ইউজেনিক চেতনা' (Eugenic Consciousness) বলে এক নতুন শব্দের প্রচলন করেছেন। তিনি বলেছেন যে এক জনসাধারণের মধ্যে এই 'ইউজেনিক চেতনা' এবং ইতিবাচক ইউজেনিকস-এর চাহিদা আপনা থেকেই তৈরি হবে। তিনি বলেছেন যে সমাজের মধ্যে যখন ব্যাপক হারে পণ্য-ভোগের অর্থনীতি এবং ছোট দম্পতি-কেন্দ্রিক পরিবারের সৃষ্টি হবে তখন ইউজেনিকস মানুষের জীবনের আর পাঁচটা জিনিসের মতো দৈনন্দিন ঘটনায় পর্যবসিত হবে।

হিটলারের নেতৃত্বে নাৎসি জার্মানি ইহুদি, স্লাভ, কৃষ্ণাঙ্গ ইত্যাদি জাতির লক্ষ লক্ষ মানুষদের খুন করে গণহত্যার মাধ্যমে এক একটা সমগ্র জাতির বিলোপসাধনের প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হল। তারপর থেকে 'ইউজেনিকস' এমন এক ঘৃণ্য শব্দে পরিণত হল যে বিজ্ঞানীমহলে এই শব্দটা এক রকম নিষিদ্ধ ছিল, এবং এখনও প্রায় তা-ই আছে।

জিনগত শ্রেষ্ঠত্ব ও তার ক্রয়মূল্য

আলডাস হাক্সলি-র বিতর্কিত উপন্যাস 'Brave New World'-এর কথা মনে পড়ে? যেখানে এক ভবিষ্যৎ-পৃথিবীর বুকে দুঃস্বপ্নের কল্পরাজ্যের বর্ণনা রয়েছে, যেখানে 'ইউজেনিকস' আর উচ্চমানের প্রযুক্তিই হল সমাজের চালিকাশক্তি? সেই পৃথিবীতে একটাই রাষ্ট্রের বিশ্ব-সরকারের তত্ত্বাবধানে স্তর-বিভাজিত সমাজে জিনের দ্বারা নির্ধারিত পাঁচখানা জাতি রয়েছে (গ্রিক বর্ণমালার প্রথম পাঁচটা অক্ষরের মতো আলফা, বিটা, গামা, ডেল্টা, এপসিলন)। আলফা-রা সবচাইতে বুদ্ধিমান এবং নেতৃত্ব দায়ী পদে অধিষ্ঠিত এবং বুদ্ধি এবং দক্ষতাহীন এপসিলন-রা খুশি মনে কায়িক শ্রম প্রদান করে। অনেকে আশঙ্কা করছেন যে আমাদের সমাজে যেখানে বিপুল শ্রেণি বৈষম্য উপস্থিত, সেখানে এই দুর্মূল্য প্রযুক্তিগুলো ক্রয় করার ক্ষমতা খুব কম পরিবারের থাকবে। এর ফলে সমাজের ওপরতলার কিছু মানুষই এগুলো ব্যবহার করে তাদের ইচ্ছে মতন 'উন্নত' মানের সন্তান উৎপাদন করতে সক্ষম হবে আর বাকি বিশাল সংখ্যার মানুষ আজীবন এই প্রযুক্তি থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে। আর যেহেতু এই উন্নত বৈশিষ্ট্যগুলো সেই শ্রেণির মধ্যে এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে বাহিত হতে হতে আরও উন্নতিসাধন করবে, তাই কয়েক প্রজন্ম পর দেখা যাবে যে সমাজে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক আধিপত্যের সঙ্গে আরেকটা নতুন ধরনের আধিপত্যের সৃষ্টি হয়েছে — সেটা হল 'জিন আধিপত্য'। যেহেতু এটা সব থেকে 'অকৃত্রিম এবং প্রকৃতিজাত', এটা বাকি সব আধিপত্যর চেয়ে শক্তিশালী, এবং যে ভাবে বাজারি কেনা-বেচার মাধ্যমে এই আধিপত্য আসবে, তাতে তা পুরনো ধরনের সব আধিপত্যকে আরও শক্তিশালী করবে। অবশ্য এখন মনে হয় সম্ভাব্য চিত্রটা ঠিক

পূর্বের নেতিবাচক ইউজেনিকস কর্মসূচিতে মূল বিষয় ছিল একটা স্বৈরাচারী রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ইচ্ছের বিরুদ্ধে কোনও 'অক্ষম' ব্যক্তি বা জাতির প্রজননহার বলপূর্বক হ্রাস করা; অপরদিকে ইতিবাচক ইউজেনিকস-এর মূল বিষয় হল কোনও জাতি নয় বরং পরিবারের স্তরে, কোনও সরকারি নির্দেশে নয় বরং ব্যক্তি মাতাপিতার স্বেচ্ছা-স্বাধীনতায়

আলডাস হাক্সলি-র বর্ণিত সমাজের মতো নয়, কেননা 'Brave New World'-এ এক কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রশক্তির নজরদারিতে বাধ্যতামূলক 'নেতিবাচক ইউজেনিকস' পরিচালিত হয়েছিল— এখনকার কল্পনায় ভবিষ্যৎ-চিত্রটা সেরকম নয়। সম্ভাব্য ভবিষ্যতকে বরং তুলনা করা যায় ১৯৯৭ এর কল্পবিজ্ঞানের সিনেমা 'Gattaca'-র মতো, যেখানে ভবিষ্যতের সমাজে আজকের উদার অর্থনৈতিক সমাজের মতো বেসরকারি সংস্থাগুলোর থেকে ক্রয় করা IVF আর PSD-এর মতো উচ্চমানের প্রযুক্তি ব্যবহার করে 'উদার ইউজেনিকস'-এর মতবাদে চালিত হয়ে স্বেচ্ছায় পরিবারগুলো নিজ পছন্দের সন্তান উৎপাদন করে। সেই সমাজে যারা প্রযুক্তির দ্বারা তৈরি হয় তাদের বলা হয় 'বৈধ' এবং যারা স্বাভাবিক প্রাকৃতিক উপায় জন্মগ্রহণ করে তাদের বলা হয় 'অবৈধ'। যদিও সে সমাজে কোনও রূপ জিন সম্পর্কিত বৈষম্য আইনত নিষিদ্ধ, তা হলেও যেহেতু খুব সহজেই একজন ব্যক্তির জিনের নকশা জেনে নিয়ে 'জিন ডেটাবেস' থেকে মিলিয়ে শনাক্ত করে বলে দেওয়া সহজ যে সে বৈধ না কি অবৈধ। তাই যে কোনও চাকরিতে দীর্ঘজীবী, বুদ্ধিমান, কম রোগাক্রান্ত 'বৈধ'রাই অগ্রাধিকার পায় এবং 'অবৈধ'রা হয়ে পড়ে প্রান্তিক।

শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর ?

ওপরের এই লেখাগুলোতে ভবিষ্যত সম্পর্কে গভীর হতাশাজনক অথচ আপাত-অবশ্যম্ভাবী একটা চিত্র হাজির করলেও, এই আশঙ্কাগুলোর মধ্যে কতখানি বাস্তব বা অদূর ভবিষ্যতে বাস্তবায়িত হওয়ার সম্ভাবনা আছে, সেটা একটু বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। কয়েকটা তথ্য এখানে পুনর্বিবেচনা করা দরকার।

যখন 'রিকমবিনেন্ট ডিএনএ প্রযুক্তি' প্রথম আবিষ্কার হল এবং ইঁদুর সহ বিভিন্ন স্তন্যপায়ীদের মধ্যে তা সফলভাবে প্রয়োগ করা গেল, তখন জীববিজ্ঞানী এবং চিকিৎসকদের মহলে একটা নতুন আশাবাদের ঢেউয়ের সূচনা হয়েছিল। মানুষের শরীরের যদি সবকটা জিনের গঠন, অবস্থান এবং বিন্যাস ঠিকভাবে দেখা যায়, তা হলে মানুষের অধিকাংশ অসংক্রামক অসুখের পিছনে এক বা একাধিক জিনের ত্রুটির ভূমিকা দেখা যাবে। সেই ত্রুটিযুক্ত জিনগুলোকে চিহ্নিত করে, তার জায়গায় যদি ঠিক জিন এই নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রতিস্থাপন করা যায়, তা হলে চিকিৎসা বিজ্ঞানে একটা বিপ্লবের সূচনা হবে। এই কারণেই মানুষের সমগ্র জিন ভাণ্ডারের প্রতিটা জিন সম্পর্কে নিখুঁত তথ্য জানার লক্ষ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে তড়িঘড়ি করে সরকারি ও বেসরকারি বিপুল অর্থব্যয় করে 'হিউমান জিনোম প্রজেক্ট' (Human Genome Project)-এর উদ্বোধন হয়। এবং প্রায় একই সঙ্গে জিন থেরাপির গবেষণার কাজ এগিয়ে চলে। প্রত্যাশা ছিল— যে জিনোম প্রজেক্টের কাজ শেষ হয়ে গেলে প্রতিটা জিন সম্পর্কে যে তথ্য উন্মুক্ত হবে তার সাহায্যে জিন থেরাপির ক্ষেত্রে একটা বিরাট উল্লম্ফন ঘটবে। কিন্তু বাস্তবে যত জিনোম প্রজেক্টের কাজ অগ্রসর হতে থাকল

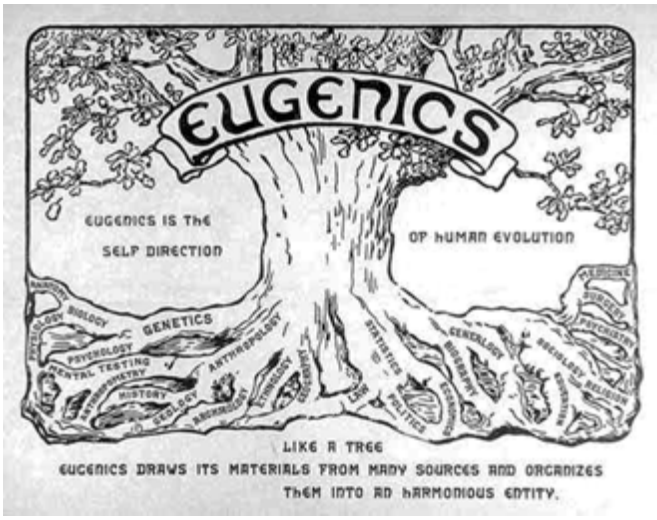

তত দেখা গেল যে মানুষের দেহে কার্যকরী জিনের সংখ্যা আশাতীত ভাবে স্বল্প।

ফলে প্রকল্প শুরুর আগে প্রতিটা অসুখের পেছনে একটা বা একাধিক নির্দিষ্ট জিনের ভূমিকার যে একচ্ছত্র ধারণা ছিল তার বদল ঘটল। দেখা গেল পুরো ব্যাপারটার ভিত্তি অনেক বেশি এই জিনসমূহের অধিক্রমণ এবং জিন-জিন ও জিন-পরিবেশ জটিল মিথস্ক্রিয়ার ওপর। ডায়াবেটিস-এর মতো একটা অসংক্রামক ব্যাধির পেছনে কয়েকটা নির্দিষ্ট ত্রুটিযুক্ত জিন এবং তাঁদের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ভূমিকা তো রয়েছেই, তার সঙ্গেও আবার যুক্ত রয়েছে এই জিনগুলোর সঙ্গে দেহের অভ্যন্তরীণ এবং বাইরের পরিবেশের একটা সদা-সক্রিয় পারস্পরিক প্রভাব। ফলে এক জন ব্যক্তির মধ্যে শুধুমাত্র ত্রুটিযুক্ত জিনের উপস্থিতি থাকলেও ডায়াবেটিস তার মধ্যে দেখা না দিতে পারে। এবং জিন থেরাপির ক্ষেত্রে যে অভাবনীয় সাফল্য প্রত্যাশা করা হয়েছিল, সেই ক্ষেত্রে আশাভঙ্গের একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ বোধ হয় এটাই। দীর্ঘ দু'দশক গবেষণার পরেও হাতে গোনা কয়েকটা বিরল 'এক-জিন সম্পর্কিত ব্যাধি' (Monogenic disease যেমন Severe Combined Immunodeficiency, Leber's Congenital Amaurosis) ইত্যাদি ছাড়া অধিকাংশ অসংক্রামক রোগের ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র সুরাহা হয়নি। এমনকী, এই সমস্ত ব্যাধিগুলোর ক্ষেত্রেও চিকিৎসা জগতে একটা নতুন চিকিৎসার পন্থা হিসেবে ঘোষণা করার মতো সর্বব্যাপী সাফল্যও আসেনি। ফলে শারীরিক ব্যাধির ক্ষেত্রেই যখন বর্তমান গবেষণা একটা অদৃশ্য প্রাচীরের সামনে গিয়ে ধাক্কা খেয়েছে, তখন মানুষের মেধা, মানসিক দক্ষতা বা চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য---- ইত্যাদির ক্ষেত্রে ব্যাপারটা আরও বেশি জটিল হতে বাধ্য। মেধা-দক্ষতা এ সব গুণাবলী পরিবেশ, সংস্কৃতি এবং মানব মস্তিষ্কের সহজাত গঠনের মধ্যে এক সদা চলমান জটিল এবং অচ্ছেদ্য মিথস্ক্রিয়ায়

আবর্তিত হয়ে চলেছে, যা শারীরিক বৈশিষ্ট্যগুলোর থেকে বহু পরিমাণে নমনীয়। তাই মনে হয়, মানব সমাজে 'মানসপ্রক্রিয়ার জেনেটিকস' (Behavioral Genetics) এবং তার বিভিন্ন পদক্ষেপ অনেক ক্ষেত্রে যে কল্প-বিজ্ঞান ছাড়া কিছু নয়।

অকারণ উচ্চাশার অন্তরালে

কিন্তু প্রশ্ন হল, বড় বড় জীববিজ্ঞানী, বড় বড় ওষুধ কোম্পানি থেকে মার্কিন সরকার, এই একই ভুল কেন করলেন? কেন তাঁরা 'হিউমান জিনোম প্রজেক্ট' শুরু হওয়ার আগে, বা সেই প্রজেক্ট শেষ হওয়ার সময়ও, তার মাধ্যমে বিরাট বাস্তব ফল পাওয়া যাবে, বা অসংক্রামক রোগগুলোকে একেবারে মূল উপড়ে দূর করা যাবে— এ রকম দাবির সপক্ষে দাঁড়ালেন, বা অন্তত সে রকম দাবির প্রতিবাদ করলেন না? এই প্রশ্নের উত্তরে আর একটা পূর্ণদৈর্ঘ্যের প্রবন্ধ লেখা দরকার, ভবিষ্যতে সেটা করা যাবে। আপাতত দুটো কথা ছোট করে বলে রাখি।

প্রথম কথা হল, বিজ্ঞানের যে কোনও শাখাতে, যে কোনও গবেষণায়, কেবল 'সত্য-আবিষ্কার' নিয়ে ভাবলে একালের বিজ্ঞানীর চলে না, তাঁদের গবেষণা চালানোর মতো (এবং নিজের নানা সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার মতো) অর্থ জোগানের কথা মাথায় রাখতে হয়। তাই গবেষণা ঘিরে একটা অতি-উৎসাহ বা 'হাইপ' তৈরির দরকার হয়। সেই হাইপ তৈরি করতে গিয়ে বিজ্ঞানীসুলভ সত্য-সন্ধানীর নিস্পৃহতা বজায় রাখা অসম্ভব। তাঁর বিশেষ গবেষণাতে কী কী হাতে-গরম ফল পাওয়া যেতে পারে, সেটাকে বাড়িয়ে বলতে হয়। যেটা হয়ত তত্ত্বগত ভাবে সম্ভব, কিন্তু বর্তমান প্রযুক্তিতে একান্তই অসম্ভব, সেটাকেই সরাসরি বা ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে প্রচারে নিয়ে আসতে হয়। পরে যখন দেখা যায় যে প্রচারিত লক্ষ্য থেকে গবেষণার ফল অনেক পেছনে পড়ে আছে, তখন বিজ্ঞানী বা গবেষকদল, বা যাঁরা কোম্পানি খুলে শেয়ার বাজার থেকে টাকা তুলেছিলেন, তাঁরা ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে চলে গেছেন।

দ্বিতীয় কথা হল, এই বিশেষ গবেষণার ক্ষেত্রে, 'খণ্ডবাদ' (Reductionism) বলে দৃষ্টিভঙ্গি বিজ্ঞানীদের বাড়াবাড়ি রকমের আশাবাদী করে তুলেছিল। 'খণ্ডবাদ' কী, সেই নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। শুধু বলে রাখি, একটা বড় সমস্যাকে এক সঙ্গে বোঝা বা সমাধান করা অনেক সময়েই অসম্ভব হয়। তখন সেই সমস্যাকে ছোট ছোট খণ্ড করে ভেঙে সেই খণ্ডগুলোর সমাধান করে পুরো সমস্যাটা সমাধান করা হয়, অনেকটা আমাদের ছোটবেলার সিঁড়িভাঙা অঙ্কের মতো। কিন্তু সব সময় টুকরো সমস্যার সমাধান জুড়ে পুরো সমস্যার সমাধান—এটা সম্ভব নয়, বা সর্বত্র প্রযোজ্য নয়। জেনেটিকসের ক্ষেত্র হল এর এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সাহায্যে ই. কোলাই জীবাণুর কোষে মানব-ইনসুলিন তৈরি করা গেছে, সুতরাং আইনস্টাইনের জিন পেলে একটা ডিম্বাণুর মধ্যে আরেকটা প্রতিভাবান পদার্থবিজ্ঞানী তৈরি করা যাবে, অতি সরল খণ্ডবাদীর যুক্তি অনেকটা এই রকম। এটা উদাহরণ মাত্র, খণ্ডবাদীরা আসলে এত সরল যুক্তি দেন, তা নয়। তবুও বলতে হয়, জীববিজ্ঞানে খণ্ডবাদী দৃষ্টিভঙ্গি এক সময়ে এবং এখনও, অনেকাংশে প্রভাবশালী। এবং প্রাণীজগতের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই এই দৃষ্টিভঙ্গির অনমনীয় প্রয়োগ যে সব অবাঞ্ছিত ধারণার উৎস তার মধ্যে এই 'জিন-সর্বস্বতাবাদ' অন্যতম।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সাহায্যে ই. কোলাই জীবাণুর কোষে মানব-ইনসুলিন তৈরি করা গেছে, সুতরাং আইনস্টাইনের জিন পেলে একটা ডিম্বাণুর মধ্যে আরেকটা প্রতিভা-বান পদার্থবিজ্ঞানী তৈরি করা যাবে, অতি সরল খণ্ডবাদীর যুক্তি অনেকটা এই রকম।

ভ্রান্ত বৈজ্ঞানিক ধারণার ওপর ভিত্তি করে সাবেক কালের 'নেতিবাচক ইউজেনিকস'-এর এক সময়ের সাময়িক ও মারাত্মক জয়যাত্রা হয়েছিল। আজকের 'ইতিবাচক ইউজেনিকস' বা 'Gene enhancement' তার থেকে অনেক সূক্ষ্ম এবং সাবধানী হলেও, সারমর্মে পার্থক্য বোধহয় খুবই কম।

লেখক পরিচিতি : ডা. সুমিত্রণ বসু এমবিবিএস, এমডি। রেডিও-ডায়াগনসিস বিশেষজ্ঞ।

শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগ ও সুন্দরবন কমপ্রিহেনসিভ এরিয়া ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল রিসার্চ সেন্টার-এর যৌথ উদ্যোগে কেনা হল একটি মোটর চালিত নৌকা।

সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকে রোগী পরিবহন ও মেডিকেল টিমের যাতায়াতের জন্য ব্যবহৃত হবে এই যানটি।

এই নৌকাটি কেনার জন্য অর্থ সংগ্রহ করেছেন দেশ বিদেশে থাকা শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগের বন্ধুরা।

ট্যুরিস্ট সিজ্‌নে নৌকাটিকে ভাড়া দিয়ে উপার্জিত অর্থে সুন্দরবন সীমান্ত স্বাস্থ্য পরিষেবার খরচ চালানো হবে।

কম খরচে সুন্দরবন ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন—

সম্পাদক, শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগ, ফোন : ৯৮৩০৯২২১৯৪

উৎপল মণ্ডল, সুন্দরবন কমপ্রিহেনসিভ এরিয়া ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল রিসার্চ সেন্টার, ফোন : ৯০৮৮০৫০৫২৫

ইন্টারনেট ডিসঅর্ডার

"ইন্টারনেট তো খুব ভাল জিনিস, কত কিছু শেখা যায়। আর এখন জেন-এক্স ছেলেমেয়েরা কেমন সুন্দর সে সব শিখে নেয় চটপট। কমপিউটারই ওদের বন্ধু আর শিক্ষক।'' এমনটাই ভাবি আমরা, তাই না? অথচ কী বিপদ, কমবয়সীদের ইন্টারনেট ঘাঁটা দেখলেই সতর্ক হতে বলছেন মনোবিজ্ঞানীরা— লিখছেন **রুমঝুম ভট্টাচার্য্য।**

আধুনিক প্রযুক্তি আজ মানুষকে এক অন্য মাত্রার জীবনযাপন করার পথ দেখিয়েছে। পৃথিবীটা আজ গুটিয়ে চলে এসেছে মানুষের হাতের মুঠোয়, 'মুঠো ফোন' রূপে। বিভিন্ন 'অ্যাপস্' (অ্যাপ্লিকেশন) বন্যার জলের মতন মানুষের রোজকার জীবনে ঢুকে পড়ছে। আজ যা নতুন আগামিকালই তা 'অবসোলিট্'। ''এখন আর ফেসবুক করি না রে, এখন 'whatsapp'-এ তোকে মেসেজ করবো'' পথ চলতে এমন কথা কানে আসে। এখন সোশ্যাল মিডিয়ার জমানা, Skype-তে আমেরিকাবাসী নাতি-নাতনির অন্নপ্রাশন প্রত্যক্ষ করার জমানা। ইন্টারনেটের নেটওয়ার্কিং নেটের অর্থাৎ জালের মতো মায়া বিস্তার করে গ্রাস করেছে আজকের আধুনিক মানুষের জীবন। প্রযুক্তির আশীর্বাদ চিরকালই তার সঙ্গে বয়ে এনেছে অভিশাপ। আর ইন্টারনেটও তার ব্যতিক্রম নয়। বিশেষত আজকের নতুন প্রজন্ম যারা যৌবনের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে বা যৌবনকালে প্রবেশ করেছে সেই সব ছেলেমেয়েরা খুব সহজেই ইন্টারনেট আসক্তির জালে জড়িয়ে পড়ছে। তার মধ্যে বিশেষ করে 'গেম' খেলার আসক্তি মারাত্মক ভাবে ক্ষতি করছে আমাদের তরুণ প্রজন্মের। 'ইন্টারনেট' ও 'ইন্টারনেট গেমিং'-এর আসক্তি কাকে বলা হচ্ছে? তার ফল ও প্রভাব কী? এবং এই সমস্যার প্রতিকারই বা কী — এ সব নিয়েই এবারের প্রতিবেদন।

ইয়ে লাল রঙ কব্ মুঝে ছোড়েগি :

আসক্তির রঙ কি লাল? জানা নেই। তবে আসক্তি একবার ধরলে তার কবল থেকে ছাড়া পাওয়া শক্ত। বিশেষ করে, বলা হচ্ছে অ্যালকোহল বা ড্রাগের আসক্তি থেকে মুক্তির তবু একটা পাকা না হোক্ কাঁচা পথ আছে, কিন্তু ইন্টারনেট আসক্তির থেকে মুক্তির পথ নেই বললেই চলে।

২০১৩ সালে ডায়াগনস্টিক অ্যাণ্ড স্ট্যাটিস্টিক্যাল ম্যানুয়াল অফ্ মেন্টাল ডিসঅর্ডারস (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) সংক্ষেপে DSM-এর পঞ্চম সংস্করণে (DSM-V) সেক্শন III-তে ইন্টারনেট গেমিং ডিসঅর্ডারকে একটা বিশেষ সঙ্কটজনক অবস্থা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর ওপর আরও গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা ভাবা হচ্ছে যাতে পরবর্তীকালে এই ডিসঅর্ডারকে প্রধান ডিসঅর্ডারগুলোর সঙ্গে তালিকাভুক্ত করা যেতে পারে। আমেরিকান সাইকিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশন (যাঁরা DSM-V তৈরি করেছেন) ইন্টারনেট ইউস ডিসঅর্ডার' (IUD) কী, সে কথা বোঝাতে বলেছেন— a person with IUD will experience 'preoccupation' with the internet or internet gaming, withdrawal symptoms when the substance (internet) is no longer available, tolerance (the need to spend more and more time

on the internet), loss of other interests, unsuccessful attempts to quit and use of the internet to improve or escape dysphoric mood.

লক্ষ্য করলে বুঝতে পারা যাবে অ্যালকোহল বা ড্রাগের নেশার মতো ইন্টারনেটের নেশারও একই বৈশিষ্ট্য।

১। Preoccupation—মানে একেবারে বুঁদ হয়ে যাওয়া;

২। Withdrawal symptoms -অর্থাৎ নেশায় বস্তু না পেলে বিভিন্ন উপসর্গ দেখা দেওয়া, যেমন—রাগ, বিষাদগ্রস্ততা;

৩। Tolerance—বার বার নেশার বস্তু পেতে চাওয়া এবং যতদিন যাবে তত বেশি 'পরিমাণে' বস্তুটা ব্যবহার;

৪। Loss of other interests—কোনও অন্য কাজকর্ম করতে না চাওয়া;

৫। Unsuccessful attempts to quit অর্থাৎ কি না নেশার বস্তু থেকে সরে আসায় অপারগতা;

৬। Improve or escape dysphoric mood—অর্থাৎ বিষাদগ্রস্ততার খপ্পর থেকে পালানোর উপায় হিসাবে নেশা করা;

৭। Negative repercussions—যেমন, বাজে তর্ক করার অভ্যাস, মিথ্যা কথা বলা, সমাজ থেকে পালানোর প্রবণতা।

তা হলে, একথা পরিষ্কার যে ইন্টারনেটের অতিরিক্ত ব্যবহার আমাদের মধ্যে আনতে পারে আসক্তি। তবে দেখা যাক সেই আসক্তির প্রভাব কী হতে পারে।

এক ভালা মানুষ কো অমানুষ বনা কর্ ছোড়া :

অরিত্র কলকাতার এক নাম করা স্কুলের প্রথমে সারির ছাত্র। চিরকাল সে স্কুলে প্রথম নয়তো দ্বিতীয় হয়েছে। মাধ্যমিকে পশ্চিমবঙ্গে সে প্রথম কুড়ি জনের মধ্যে স্থান পেল। বাবা-মার কাছে আবদার করে বসল তার ইন্টারনেট কানেকশন্ চাই। অরিত্র তার বাবা মায়ের নয়নের মণি। ছেলের চাহিদা পূরণ করতে পেরে তাঁরাও খুশি। কিন্তু কিছুদিন পর থেকে অরিত্রর আচরণে পরিবর্তন লক্ষ্য করলেন তাঁরা। সে সব সময় দরজা জানলা বন্ধ করে ঘরে থাকছে। জিজ্ঞাসা করলে বলে ইন্টারনেটে পড়াশোনা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে সে। তার খাওয়াদাওয়া অনিয়মিত হতে লাগল। বাবা-মা কাজ থেকে বাড়ি ফেরবার পর তাদের সঙ্গে কথা বলতে চায় না, কোথাও যেতে চায় না। ঘন ঘন মেজাজ হারিয়ে খারাপ ব্যবহার করা শুরু করল। মুখে মুখে তর্ক করার অভ্যাস হয়ে গেল।

আর দু'বছর পর যখন হায়ার সেকেন্ডারির রেজাল্ট বেরলো দেখা গেল সে তার বুদ্ধিবৃত্তি অনুযায়ী যথেষ্ট ভাল ফল করতে পারেনি। জানা গেল সে সব সময়ে ইন্টারনেটে গেম খেলত। অর্থাৎ ইন্টারনেট আসক্তির দীর্ঘমেয়াদী কুপ্রভাব অরিত্রর অ্যাকাডেমিক কেরিয়ারের ওপর প্রতিফলিত হল। একজন ভাল ছেলের এই অবনতি কেন হল? বিশেষত কমবয়সী ছেলেমেয়েরাই

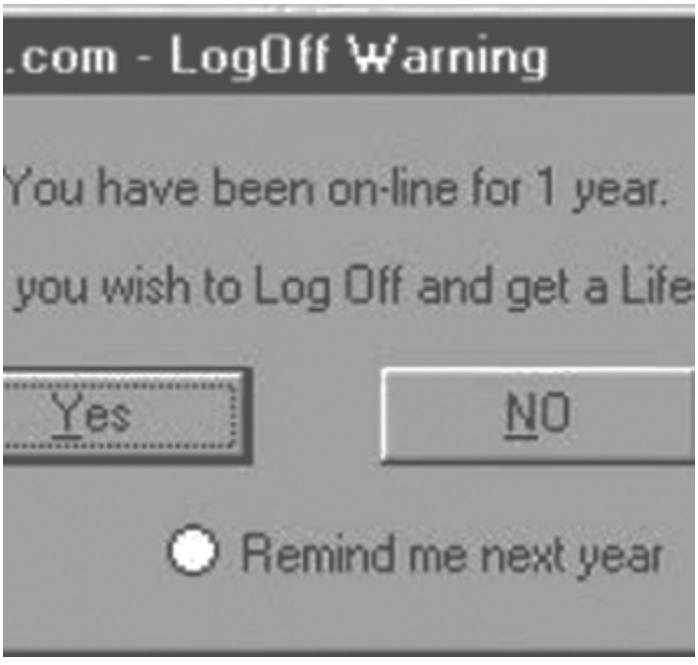

এই আসক্তির কবলে পড়ছে বেশি। কারণ তাদের মধ্যে প্রলোভনে জড়িয়ে পড়ার প্রবণতা বয়স্ক মানুষদের তুলনায় বেশি।

এখনও পর্যন্ত পাওয়া গবেষণার ফলাফল থেকে জানা যাচ্ছে (কম বয়সী এশিয়ান ছেলেদের ওপর বেশিরভাগ গবেষণাপত্র তৈরি হয়েছে) যখন মানুষ ইন্টারনেট বা ইন্টারনেট গেমে ডুবে থাকে তখন ড্রাগে আসক্ত মানুষের ড্রাগ নিলে মস্তিষ্কে যে যে অংশ ও যে পরিমাণে উত্তেজিত হয় ঠিক সেই সেই অংশ একই ভাবে উত্তেজিত হয়। ইন্টারনেট আসক্তি একটা বিশেষ স্নায়বিক সাড়া (নিউরোলজিক্যাল রেসপন্স) তৈরি করে যার প্রভাব অনুভূতি-র ওপর পড়ে। গবেষণায় দেখা গেছে ইন্টারনেটে আসক্ত মানুষের মস্তিষ্কে বিশেষ পরিবর্তন ঘটে।

বিশেষত মস্তিষ্কে ও মস্তিষ্ক কোষের যে অংশগুলো দ্বারা মনোযোগ, অনুভূতি ও প্রক্ষোভ (feelings & emotion) নিয়ন্ত্রিত হয় সেগুলোর ওপর এই আসক্তির বিশেষ প্রভাব আছে। এবং এই পরিবর্তন কোকেন বা হেরোইনে আসক্ত মানুষের মস্তিষ্কেও দেখা যায়। ডোপামিন আমাদের মস্তিষ্কে আনন্দ (pleasure) ও পুরস্কারের (reward) অনুভূতি জাগায়— গবেষণায় দেখা গেছে ইন্টারনেটে আসক্ত মানুষের মস্তিষ্কের ডোপামিন রিসেপটরগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

অতএব এই কুপ্রভাব সম্বন্ধে জানার পর এই প্রশ্নই মনে জাগে - তবে কী ভাবে এই আসক্তির থেকে বেরনো সম্ভব?

হমে ইতনা শক্তি দেনা দাতা : ইন্টারনেট আসক্তি থেকে নিজেকে মুক্ত করার কাজটা সত্যিই কঠিন। কারণ ইন্টারনেট বর্জিত জীবন যাপন আজকের দিনে অসম্ভব। তা হলে যেটা করতে হবে, তা হল কী ভাবে ইন্টারনেটের যথাযথ ব্যবহার করতে হবে তা শেখা। একেবারে বর্জন সহজ, কিন্তু বর্জন না করে নেশার বস্তুকে যথাযথ ব্যবহার করে তার সুফল ভোগ করার কাজটা অনেক কঠিন।

কিছু কিছু গবেষণায় দেখা যাচ্ছে কগ্‌নিটিভ্ বিহেভিয়ার থেরাপি (cognitive behavior therapy) ইন্টারনেটে আসক্তি দূর করার ক্ষেত্রে প্রভাবশালী একটা চিকিৎসা পদ্ধতি। এই পদ্ধতি ব্যবহার করে ইন্টারনেটে আসক্ত মানুষটাকে শেখানো হয়, কী করে প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার করা যেতে পারে এবং এই বিশেষ ব্যবহার কী করে সীমিত করা যেতে পারে। মোদ্দা কথা, নিয়ন্ত্রণ কী ভাবে করানো যেতে পারে তাই শেখানো হয়। এই চিকিৎসা পদ্ধতিতে বিশেষ সুফল পাওয়া যাচ্ছে।

এই নাতিদীর্ঘ আলোচনার শেষে এই কথাই বলা শ্রেয় সাবধানতা ও প্রতিরোধ সব সময়েই (দীর্ঘমেয়াদী ও অনেকাংশে অসফল) চিকিৎসার থেকে শ্রেয়। 'Prevention is better than cure'। তাই বাবা মাদের উচিত তাদের পরবর্তী প্রজন্মকে প্রযুক্তির যথার্থ ব্যবহার শেখানো। নির্দিষ্ট সময় ছাড়া অযথা ইন্টারনেট ব্যবহারের অভ্যাস যাতে না হয় সেই শিক্ষা দিলেই আখেরে তাঁদের সন্তানদের ভাল করা হবে।

লেখক পরিচিতি : রুমঝুম ভট্টাচার্য, মনোবিদ (ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট) ও প্রাবন্ধিক, প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন।

advt.

অনীক

'অনীক' পত্রিকা ৫০ বছর পেরিয়েছে। এই দীর্ঘ সময় ধরে অনীক চেষ্টা করেছে সমসাময়িক গণতান্ত্রিক ও বিপ্লবী রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অংশ হতে। 'অনীক'-এর বয়োপ্রাপ্তির ইতিহাস তাই সমকালীন গণ-আন্দোলনের চলমান দর্পণও বটে। কোনো বিশেষ দল বা গোষ্ঠীর মুখপত্র না হয়েও, সামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গীকারে অবিচল থেকে সমকালীন রাজনীতি-অর্থনীতি ও সামাজিক প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে— রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ ছাড়াও গল্প-কবিতা-নাটক ইত্যাদির মাধ্যমে।

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ১৫০ টাকা (সডাক)

অনীক,

প্রযত্নে : পিপলস বুক সোসাইটি। ১০/২ বি রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা - ৭০০০০৯

ফোন—৯৪৩২৮৭৭৫৬০/৯৮৩০১৪৩৩৬৫/৯৪৩৩৭২৪৪৬২

পশ্চিমবঙ্গের সরকারি চিকিৎসা পরিষেবা : ঘোষণা ও বাস্তব

স্বাস্থ্য মানে কেবল চিকিৎসা-পরিষেবা নয়, কিন্তু এই আলোচনা পশ্চিমবঙ্গের চিকিৎসা-পরিষেবা, বিশেষত সরকারি চিকিৎসা পরিষেবাতেই সীমিত। তৃণমূল সরকারের তিন বছর পার হয়ে গেল, এই তিন বছরে চিকিৎসা-সংক্রান্ত অনেক পদক্ষেপ করেছে সরকার, অনেক ঘোষণা করেছে। তিন বছর পর ঘুরে দেখাই যায়— কী ছিল পদক্ষেপগুলো আর কতটাই বা সুফল পাচ্ছেন মানুষ। লিখছেন **ডা. পুণ্যব্রত গুণ।**

জনস্বাস্থ্য ও সরকারি নীতি নিয়ে দু'দিনের এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় ১৭-১৮ই জুলাই, ২০১৪, সল্টলেকে ইন্সটিটিউট অফ ডেভেলপমেন্টাল স্টাডিজ কলকাতায়। দ্বিতীয় দিন সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা অবধি এক প্যানেল আলোচনা হয় একই বিষয়ে। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন অর্থনীতিবিদ জাঁ দ্রেজ, পশ্চিমবঙ্গের পূর্বতন বিশেষ স্বাস্থ্য সচিব দিলীপ ঘোষ, নারী ও শিশুকল্যাণ বিভাগের প্রতিমন্ত্রী ডা. শশী পাঁজা, রাজ্য অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান ও মাল্টিডিসিপ্লিনারী এক্সপার্ট গ্রুপ অন হেলথ-এর সদস্য অধ্যাপক অভিরূপ সরকার, ইন্সটিটিউট অফ হাইজিন এন্ড পাবলিক হেলথ-এর স্বাস্থ্য-শিক্ষা বিভাগের প্রধান ডা. মধুমিতা দোবে এবং ডা. পুণ্যব্রত গুণ। ডা. গুণের বক্তব্যের ঈষৎ বর্ধিত রূপ এই প্রবন্ধ।

জেনেরিক প্রেসক্রিপশন শুরু করা হয় কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ, আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও ন্যাশানাল মেডিক্যাল কলেজে, তারপর অন্যান্য সরকারি হাসপাতালগুলোতে। কারা সরকারি নির্দেশ মানছেন না, তার ওপর কড়া নজরদারি চালানো হয়।

২০১১-এ ৩৪ বছরের পুরনো বামফ্রন্ট সরকারের পতনের পর নতুন তৃণমূল সরকার গঠনের পর থেকেই স্বাস্থ্য দপ্তরের পূর্ণমন্ত্রীর দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর হাতে, তাই সরকারি নীতি-নির্ধারণে স্বাস্থ্য যথেষ্ট গুরুত্ব পাবে, এমনটাই আশা করেছিলেন সাধারণ মানুষ।

শুরুতে যাতায়াতের পথে সরকারি হাসপাতালে হঠাৎ করে ঢুকে পড়ে হাসপাতালের অব্যবস্থা দূর করার কিছু চেষ্টা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তারপর আসে কতগুলো নির্দেশ, কিছু কাজ।

কিছু সরকারি হাসপাতালে ডিজিটাল এক্সরে, সিটি স্ক্যান ও এমআরআই মেশিন বসানোর কথা চলছে। ডায়ালিসিসের ব্যবস্থা করা হবে। সরকার মেশিন কিনবে, পরিচালনা করবে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান।

● ২০১২-র ফেব্রুয়ারি মাসে সরকারি ডাক্তারদের জেনেরিক নামে ওষুধ লিখতে নির্দেশ দেওয়া হয়। এর আগে ২০০২-এ মেডিক্যাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া-র কোড অফ এথিক্সে ডাক্তারদের জেনেরিক নামে ওষুধ লেখার কথা বলা হয়। ২০০৫-এ পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন সরকার সরকারি ডাক্তারদের জেনেরিক নামে প্রেসক্রাইব করার নির্দেশ দেন। তাতে কোনও ফল হয়নি। এই বার প্রথম পর্যায়ে জেনেরিক প্রেসক্রিপশন শুরু করা হয় কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ, আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে, তারপর অন্যান্য সরকারি হাসপাতালগুলোতে। কারা সরকারি নির্দেশ মানছেন না, তার ওপর কড়া নজরদারি চালানো হয়।

● বিগত সরকার ও বর্তমান সরকার দুইয়েরই মাথাব্যথার একটা বড় কারণ ছিল ও আছে— শিশুমৃত্যু, বিশেষত হাসপাতালে শিশু ও নবজাতকের মৃত্যু। নবজাতক ও শিশুমৃত্যুর হার কমানোর জন্য ডা. ত্রিদিব বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এক উচ্চস্তরীয় টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়।

● অরেকটা উচ্চস্তরীয় টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয় ডা. সুব্রত মৈত্রের নেতৃত্বে। এঁদের কাজ দ্বিতীয় স্তরের হাসপাতাল অর্থাৎ জেলা ও মহকুমা হাসপাতাল, স্টেট জেনারেল হাসপাতালগুলো পরিদর্শন করে উন্নয়নের জন্য সুপারিশ করা।

● ২০১১-র আগে অসুস্থ নবজাতকদের চিকিৎসার জন্য সিক নিওনেটাল কেয়ার ইউনিট (এস এন সি ইউ) ছিল ৬টা। এখন তা বাড়িয়ে করা হয়েছে ৪০টা, এ বছরের শেষে সেই সংখ্যা ৫০-এ পৌঁছনোর কথা।

● এছাড়া বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে অসুস্থ নবজাতকদের স্থিতিশীল করার জন্য সিক নিওনেটাল স্টেবিলাইজিং ইউনিট স্থাপিত হয়েছে ১২৭টা। এ বছরের শেষে আরও ১৭৩টা ইউনিট স্থাপিত হওয়ার কথা।

● ১১ই ডিসেম্বর, ২০১২ থেকে আগস্ট, ২০১৩-র মধ্যে ৩৫টা সরকারি হাসপাতালে ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান স্থাপিত হয়েছে, যেগুলো থেকে রোগীরা ১৪২টা অত্যাবশ্যক ওষুধ ৪৮% থেকে ৬৭.২৫% কম দামে কিনতে পারেন। তাছাড়াও এসব দোকানে পাওয়া যায় অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টিতে ব্যবহার্য স্টেন্ট, পেস-মেকার, অস্থিচিকিৎসায় ব্যবহার্য ইমপ্ল্যান্ট, ইত্যাদি। আরও ৮৬টা সরকারি হাসপাতালে ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান স্থাপন করার পরিকল্পনা রয়েছে।

● এর পাশাপাশি আছে ন্যায্য মূল্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা। ৮৪টা ব্লক প্রাইমারি স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও গ্রামীণ হাসপাতালে প্রয়োজনীয় প্যাথলজিক্যাল

পরীক্ষা ও এক্স-রের ব্যবস্থা হয়েছে পিপিপি মডেলে। ২২টা সিটি স্ক্যান মেশিন ও ৮টা এমআরআই মেশিন বসেছে। এগুলোর মধ্যে কিছু অবশ্য বামফ্রন্টের আমলেই চালু করা হয়েছিল।

● যে সব হাসপাতালে ব্যবস্থা নেই, সে সবের মধ্যে কিছু সরকারি হাসপাতালে ডিজিটাল এক্স-রে, সিটি স্ক্যান ও এমআরআই মেশিন বসানোর কথা চলছে। ডায়ালিসিসের ব্যবস্থা করা হবে। সরকার মেশিন কিনবে, পরিচালনা করবে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান।

● মেডিক্যাল কলেজের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১৭, সিটের সংখ্যা ২২০০। পিপিপি মডেলে ৩টে মেডিক্যাল কলেজ খোলার উদ্যোগ চলছে।

● ৭টা স্বাস্থ্য জেলা হয়েছে—বিষ্ণুপুর, ঝাড়গ্রাম, নন্দীগ্রাম, ডায়মন্ড হারবার, আসানসোল, রামপুরহাট ও বসিরহাট।

● রাজ্যের ফিনান্স কমিশনের চেয়ারম্যান ও মাল্টি-ডিসিপ্লিনারি গ্রুপ অন হেলথের সদস্য অধ্যাপক অভিরূপ সরকার জানিয়েছেন— পশ্চাৎপদ এলাকা উন্নয়নের তহবিল দিয়ে গ্রামাঞ্চলে ১৩টা মাল্টি-স্পেশালিটি হাসপাতাল স্থাপনের কাজ চলছে, আরও ২১টা স্থাপনের পরিকল্পনা।

● জেলা হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালগুলোকে রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বীমা যোজনার অন্তর্গত করা হয়েছে। ১৩টা জেলা হাসপাতাল, ৫টা মেডিক্যাল কলেজ ও ২টো মহকুমা হাসপাতালে এই পরিষেবা পাওয়া যাচ্ছে।

● ২০১৪-র ৯ই জানুয়ারি জারি হওয়া এক সরকারি মেমোরেন্ডামে বলা হয়েছে যে সরকারি হাসপাতালে আউটডোর ও ইন্ডোরের ফ্রি বেডগুলোতে বিনামূল্যে অত্যাবশ্যক ওষুধ সরবরাহ করা হবে। সরকারি ওষুধের তালিকায় জীবনদায়ী ওষুধের সংখ্যা ৪৮, অত্যাবশ্যক ক ৬৭, অত্যাবশ্যক খ ৬৮ এবং অত্যাবশ্যক গ ৫৬টা।

● ৩রা মার্চ, ২০১৪-এ জারি হওয়া এক আদেশে বলা হয়েছে, এখন থেকে সরকারি হাসপাতালে ডাক্তারের লেখা ওষুধের পুরো কোর্স পাওয়া যাবে।

কিন্তু বাস্তবটা ঠিক কী রকম?

চিকিৎসাক্ষেত্রে সরকারের যে সাফল্যের কথা বললাম, তার অধিকাংশ তথ্য আমরা পেয়েছি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্যদপ্তরের প্রকাশনা 'হেলথ অন দি মার্চ' থেকে। কিন্তু বাস্তবে মানুষ কতটা কী পাচ্ছেন দেখা যাক।

● গ্রাম ও শহরে স্বাস্থ্য পরিষেবায় বিরাট বৈষম্য। ২০১২-১৩-র পরিসংখ্যান অনুযায়ী রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ থাকেন, সেখানে পাশ-করা আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের চিকিৎসক ১৩১১৭ জন, অথচ শহরাঞ্চলে ডাক্তারের সংখ্যা ৩৯৩৪৯ জন। আসলে কিন্তু গ্রামে আরও কম সংখ্যক ডাক্তারকে পাওয়া যায়, গ্রামের সরকারি হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাঁদের পোস্টিং তাঁদের অনেকেই সপ্তাহে ২-৩দিন গ্রামে থাকেন, বাকি দিন শহরে। গ্রামের হাসপাতালে শয্যাসংখ্যা ১৬,৮৬২, শহরে ৯২,১০০ অর্থাৎ শহরে শয্যার সংখ্যা গ্রামের প্রায় ৫.৫ গুণ। গ্রামাঞ্চলে যে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা থাকেন তাঁরা আবার গ্রামীণ সমাজ-জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন। সরকার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, গ্রামীণ হাসপাতাল, মহকুমা ও জেলা হাসপাতালে ডাক্তারদের ধরে রাখতে পারছেন না। গ্রামের মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতালের ডাক্তার কোথা থেকে পাওয়া যাবে— আমাদের বোধগম্য হচ্ছে না।

গ্রামের মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতালের ডাক্তার কোথা থেকে পাওয়া যাবে— আমাদের বোধগম্য হচ্ছে না।

● জেনেরিক নামে প্রেসক্রিপশন একটা ইতিবাচক পদক্ষেপ হলেও অধিকাংশ ওষুধ জেনেরিক নামে পাওয়া যায় না। জেনেরিক প্রেসক্রিপশনে রোগী কোনও ব্রান্ডের ওষুধ পাবেন, তা নির্ভর করে ওষুধের দোকানির ওপর, দোকানির যে ব্র্যান্ডে লাভ বেশি, সাধারণত সেই ব্র্যান্ড পান রোগী। সমস্ত প্রয়োজনীয় ওষুধ জেনেরিক নামে উৎপাদিত না হলে জেনেরিক প্রেসক্রিপশনের লাভ মানুষ পেতে পারেন না। রাজ্য সরকার বলতেই পারেন, ওষুধ-শিল্প তো রাজ্যের নিয়ন্ত্রণে নয়। কিন্তু রাজ্যের ড্রাগ কন্ট্রোল তো স্বাস্থ্য দফতরের নিয়ন্ত্রণে, ড্রাগ কন্ট্রোল তো ড্রাগ অ্যান্ড কসমেটিকস আইন মেনে ব্র্যান্ড নামে ওষুধের লাইসেন্স দেওয়া বন্ধ করতেই পারে। তা ছাড়া কিছু রুগ্ন ওষুধ কারখানা সরকারের নিয়ন্ত্রণে আছে বহুবছর ধরে, সেগুলোতে তো জেনেরিক নামে অত্যাবশ্যক ওষুধ তৈরি করাই যায়।

● শিশুমৃত্যু কমানোর জন্য এসএনসিইউ ভাল হাতিয়ার হতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেগুলোতে ডাক্তার ও নার্স বাড়ন্ত। কলকাতার বাইরে এক পুরনো মেডিক্যাল এসএনসিইউ-তে বেশ কয়েক মাস কাজ করেছেন এমন এক জন ডাক্তারের কাছে জানা— সেখান থেকে কোনও অসুস্থ বাচ্চাকেই ফেরানো হয় না, ফলে এসএনসিইউতে বাচ্চার সংখ্যা হয় প্রায় ৭০, দেখার জন্য মেডিক্যাল অফিসার ২ জন, নার্স—মর্নিং ও ডে শিফটে ৩ জন, নাইট শিফটে ২জন। নার্সদের ৯০% সময় যায় ২ ঘণ্টা ছাড়া ছাড়া বাচ্চাদের খাওয়াতে। ওয়ার্মার চলে, কিন্তু তার দিকে খেয়াল রাখার সময় মেলে না— কোথাও হয়তো ওয়ার্মার বন্ধ হয়ে বাচ্চা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, কোথাও বেশি গরমে ফোস্কা...। কিছু কিছু ক্ষেত্রে শোনা যায় পরিকাঠামোও পর্যাপ্ত নয়।

সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য যোজনা কমিশনের উচ্চস্তরীয় বিশেষজ্ঞ দলের সুপারিশ কিন্তু পিপিপি-র বিরুদ্ধে।

● ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান, ন্যায্য মূল্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষা— প্যাথলজি, রেডিওলজি, ডিজিট্যাল এক্সরে, সিটি স্ক্যান, এমআরআই স্ক্যান এবং ন্যায্য মূল্যে ডায়ালিসিস পরিষেবা----এই সবগুলোই পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) অর্থাৎ সরকারি পরিকাঠামো ব্যবহার করে স্বাস্থ্য-ব্যবসায়ীদের মুনাফা লোটা। নতুন করে ডিজিট্যাল এক্স-রে, সিটি স্ক্যান, এমআরআই স্ক্যান এবং ন্যায্য মূল্যে ডায়ালিসিস পরিষেবা শুরু করার যে পরিকল্পনা তা তো ভয়ঙ্কর। সেখানে স্বাস্থ্য দপ্তর মেশিন বসাবে বিভিন্ন ফান্ড থেকে টাকা জোগাড় করে, 'অপারেট আর ম্যানেজ' করবে বেসরকারি মালিক। সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য যোজনা কমিশনের উচ্চস্তরীয় বিশেষজ্ঞ দলের সুপারিশ কিন্তু পিপিপি-র বিরুদ্ধে।

জেনেরিক প্রেসক্রিপশনে রোগী কোনও ব্রান্ডের ওষুধ পাবেন তা নির্ভর করে ওষুধের দোকানির ওপর, দোকানির যে ব্র্যান্ডে লাভ বেশি সাধারণত সেই ব্র্যান্ড পান রোগী।

● ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকানগুলোর কিছু ইতিবাচক প্রভাব অবশ্যই স্বীকার করা উচিত—এইগুলোর চাপে পশ্চিমবঙ্গের ওষুধের দোকানিদের সংগঠন বিসিডিএ (বেঙ্গল কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিস্টস' এসোশিয়েশন) বাধ্য হয়েছে এমআরপি-র চেয়ে কমে ওষুধ বিক্রি করতে। অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টিতে ব্যবহার্য স্টেন্ট, হার্ট ব্লকে ব্যবহার্য পেসমেকারের দাম প্রায় কুড়ি হাজার টাকা করে কমে গেছে, অসাধু ডাক্তারদের কমিশন খাওয়া কমেছে। কিন্তু ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকানের বিরুদ্ধেও বলার আছে— ১৪২টা অত্যাবশ্যক ওষুধের কথা বলা হয়েছে, আসলে কিন্তু ওষুধের সংখ্যা ১৩৩টা, বাকি ৯টার পুনরাবৃত্তি আছে। এই ১৩৩টার মধ্যেও আবার একই ওষুধের বিভিন্ন রূপ আলাদা আলাদা তালিকাভুক্ত হয়েছে, ব্যাপারটা এরকম---- অ্যামোক্সিসিলিন-এর ৫০০ মিলিগ্রাম ক্যাপসুল, ২৫০ মিলিগ্রাম ক্যাপসুল, ১২৫ মিলিগ্রাম বড়ি ও সিরাপ---- মোট ৪ বার তালিকাভুক্ত হয়েছে অ্যামোক্সিসিলিন। তালিকা ভালভাবে বিশ্লেষণ করে আমরা দেখেছি আসলে কাজের ওষুধের সংখ্যা ৯০টা। এই ৯০টা ওষুধের মধ্যে আবার ৬৮টাই কেবল ভারতের জাতীয় অত্যাবশ্যক ওষুধের তালিকাভুক্ত। জাতীয় তালিকায় ওষুধের সংখ্যা ৩৪৮টা। ছাড় দেওয়া হচ্ছে একেক দোকানে একেক রকম। কম দামের ব্র্যান্ডেড জেনেরিক না রেখে, দামি ব্র্যান্ডেড জেনেরিক রাখা হচ্ছে যাতে ছাড় দিয়েও বেশি লাভ করা যায়।

সরকারি হাসপাতালে RSBY কার্ডের সুবিধা পেতে গেলে সুপারিন্টেন্ডেন্টের অনুমতি নিতে হয়, অনুমতি-পত্রে সই করানোর জন্য দালাল আছে...।

● নতুন মেডিক্যাল কলেজের কিছু বেসরকারি। সরকারি মেডিক্যাল কলেজে সাড়ে ৪ বছর ডাক্তারি পড়তে খরচ হয় ৪০,৫০০ টাকা। বেসরকারি কলেজে জয়েন্ট এন্ট্রান্স দিয়ে ভর্তি হলে প্রায় ৫ লাখ, কলেজের প্রবেশিকা দিয়ে ভর্তি হলে প্রায় ২২ লাখ, এনআরআই কোটায় ৫৫ লাখ—অর্থাৎ বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের পেছনে মুনাফাই প্রধান উদ্দেশ্য। সরকারি মেডিক্যাল কলেজে সিট বাড়ানো হলেও লেকচার থিয়েটার, ল্যাবরেটরি, হস্টেল, শিক্ষক কোনও কিছুই বাড়ানো হয় নি। নতুন সরকারি মেডিক্যাল কলেজ খোলা হয়েছে পরিকাঠামো না বানিয়েই। এবার সরকার পরিকল্পনা করছে পিপিপি মডেলে মেডিক্যাল কলেজ খোলার— কুচবিহার, নদীয়া জেলার ধুবুলিয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগণার ভাঙরে তিনটে মেডিক্যাল কলেজ খোলার জন্য 'এক্সপ্রেসন অফ ইন্টারেস্ট' (আগ্রহ-প্রকাশ) আহ্বান করা হয়েছে। বেশি টাকা দিয়ে যারা ডাক্তার হবে, তাদের সরকার কী কাজে লাগাবে?

বেশি টাকা দিয়ে যারা ডাক্তার হবে, তাদের সরকার কী কাজে লাগাবে?

● মেডিক্যাল পাঠক্রমেও কোনও বড় রকম পরিবর্তন হয়নি। প্রান্তিক মানুষজনের স্বাস্থ্য সমস্যা সেখানে গুরুত্ব পায় না। যেমন ২০১২-র সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে মোট ২৩০৩৫ জন সাপের কামড় খান, মারা যান ৩২৮ জন। অথচ ডাক্তারদের সর্পদংশনে এভিএস চিকিৎসা শেখানো হয় না। পেশাগত রোগগুলো যথাযোগ্য স্থান পায় না পাঠক্রমে। এমনকী, নতুন মেডিক্যাল গ্রাজুয়েটরা অনেকেই ডায়রিয়া বা সর্দিকাশির মতো সাধারণ রোগগুলোর চিকিৎসায় দক্ষ নন।

● ২০০৮-এর ১লা এপ্রিল থেকে রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনার মাধ্যমে গরীব মানুষের চিকিৎসার একটা চেষ্টা চলছে। কিন্তু অনেক গরিব মানুষই এখনও RSBY কার্ড পাননি। এই যোজনা নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগও প্রচুর। কার্ড পুনর্নবীকরণের জন্য টাকা লাগে না, টাকা নেওয়া হচ্ছে। বিমায় যে সব প্যাকেজ আছে, সেই প্যাকেজে চিকিৎসা করে কার্ড থেকে টাকা কাটার পর অতিরিক্ত টাকা নেওয়া হচ্ছে রোগীর কাছ থেকে। ছোট কোনও অপারেশন করে বড়ো অপারেশন দেখিয়ে বেশি টাকা নিচ্ছে বেসরকারি হাসপাতাল-নার্সিং হোম। কোনও কোনও জেলায় বিমার টাকা পেতে বেসরকারি হাসপাতাল-নার্সিং হোমের ডাক্তাররা প্রয়োজন ছাড়াই মহিলাদের হিস্টেরেক্টমি অপারেশন করে দিচ্ছেন। সরকারি হাসপাতালে RSBY কার্ডের সুবিধা পেতে গেলে সুপারিনটেন্ডেন্টের অনুমতি নিতে হয়, অনুমতি-পত্রে সই করানোর জন্য দালাল আছে...।

● সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে অত্যাবশ্যক ওষুধ দেওয়ার ৯ই জানুয়ারি, ২০১৪-র মেমোরেন্ডাম ও পুরো কোর্সের ওষুধ দেওয়ার ৩রা মার্চ, ২০১৪-র আদেশ সরকারি হাসপাতালে পৌঁছয়নি বলে জানিয়েছে নদীয়া ও দক্ষিণ ২৪ পরগণায় আমাদের বন্ধু সংগঠনগুলো।

● ৯ই জানুয়ারির মেমোরেন্ডামে প্রামাণ্য চিকিৎসা বিধি (Standard Treatment Guidelines)-র কথা বলা হয়েছে। এমন বিধি তৈরি আছে কেবল প্রাথমিক স্তরের চিকিৎসার জন্য, তাও তা বহুল প্রচারিত নয়।

আপনাকে পয়সা দিতে হবে না। কর থেকে সংগৃহীত অর্থে চলবে সমস্ত চিকিৎসা-পরিষেবা। অর্থাৎ স্বাস্থ্য পরিষেবার রাষ্ট্রীয়করণ চাই।

চিকিৎসা-পরিষেবার সমস্যাগুলো অনেক গভীরে, ছোটখাট সংস্কারে কিছু হওয়ার নয়। চাই সবার জন্য স্বাস্থ্য, রাষ্ট্র সমস্ত নাগরিকের স্বাস্থ্যরক্ষার দায়িত্ব নেবে এমন একটা ব্যবস্থা। সেখানে সমস্ত ডাক্তার হবেন রাষ্ট্রের নিযুক্ত, আপনার রোগ হলে কোন্ ডাক্তারের কাছে যাবেন তা হবে পূর্ব-নির্ধারিত, তিনি ওষুধ বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা লিখবেন প্রামাণ্য চিকিৎসাবিধি মেনে, কোনও বিশেষজ্ঞের কাছে বা হাসপাতালে ভর্তির জন্য তিনি পাঠাবেন তাও পূর্ব নির্ধারিত, কোনও ধাপেই আপনাকে পয়সা দিতে হবে না। কর থেকে সংগৃহীত অর্থে চলবে সমস্ত চিকিৎসা-পরিষেবা। অর্থাৎ স্বাস্থ্য পরিষেবার রাষ্ট্রীয়করণ চাই।

লেখক পরিচিতি : পুণ্যব্রত গুণ এমবিবিএস, জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের কর্মী, চেঙ্গাইল শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যের বৃত্তে পত্রিকার সম্পাদক।

সেক্স ও জেন্ডার

জৈবিক লিঙ্গ আর সামাজিক লিঙ্গ। সেক্স আর জেন্ডার। আমাদের ধারণায়, দু'টো মাত্র সেক্স— স্ত্রী আর পুরুষ। চিকিৎসাশাস্ত্র কিন্তু দেখিয়ে দিয়েছে, নানা ক্ষেত্রে নানা কারণে স্ত্রী-পুরুষ এ-দু'য়ের বাইরে তৃতীয় কিছু থাকতে পারে, আছে, যদিও তারা সংখ্যালঘু। দেখিয়ে দিয়েছে, কিন্তু তাদের জন্য কোনও স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করেনি। করবে কেন? চিকিৎসাশাস্ত্র তো নিরালম্ব বায়ুভুক কিছু নয়। যে সমাজে চিকিৎসাশাস্ত্র কাজ করে, সেই সমাজ স্পষ্ট দু'টো জৈবিক লিঙ্গ (সেক্স) আর তার ওপর ভর করে স্পষ্ট দু'টো লিঙ্গের সামাজিক নির্মাণ (জেন্ডার) এতেই বিশ্বাসী যে! কিন্তু শারীরিকভাবে ও মানসিক, সামাজিকভাবে কিছু কিছু মানুষ অন্যরকম থাকেই যে— লিখছেন

ডা. অরূপ ঢালী ও ডা. রঞ্জিতা বিশ্বাস।

আমরা পাঠ্য বইতে পড়েছি বা দৈনন্দিনতায় জেনেছি যে মানুষের দু'টি জৈবিক লিঙ্গ বা সেক্স এবং দু'টি সামাজিক লিঙ্গ বা জেন্ডার। আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা সেক্স ও জেন্ডার শব্দদ্বয় ব্যবহার করব। কারণ, বাংলা ভাষায় এ দু'য়ের সঠিক প্রতিশব্দ আমরা খুঁজে পাইনি। কিন্তু বর্তমান যুগে এই দুই শব্দ ও তার ব্যঞ্জনা আমাদের জীবনযাপনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে। আমাদের আলোচনায় মূলত এই দুটি শব্দকে ঘিরেই।

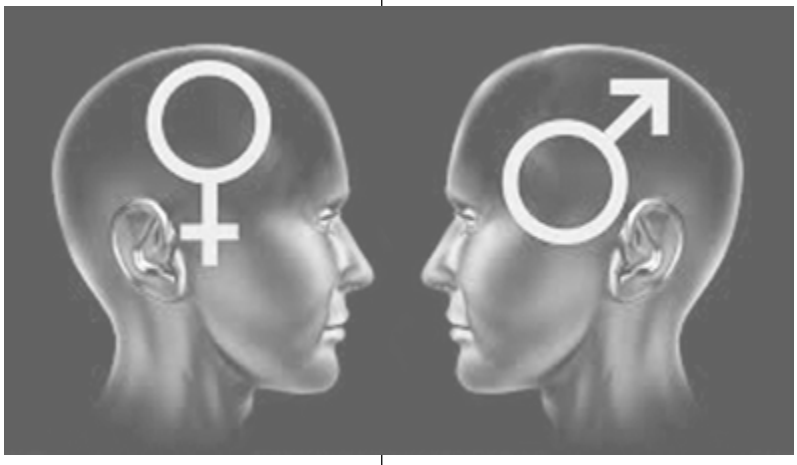

কিছু দিন আগে এক জন খেলোয়াড়ের লিঙ্গ নির্ধারণ বা সেক্স ডিটারমিনেশন নিয়ে জটিলতা আমরা সংবাদমাধ্যমের মধ্য দিয়ে প্রত্যক্ষ করেছি। দেখেছি তাঁর ডাক্তারি পরীক্ষার সময়ের ভিডিও এমএমএস মারফৎ কী ভাবে ছড়িয়ে পড়ল। মানুষটা পুরুষ না স্ত্রী, এই প্রশ্নে সংবাদমাধ্যম বা আমজনতার মধ্যে চলতে থাকা তোলপাড়ও আমাদের স্মৃতি থেকে মুছে যায়নি। অদম্য কৌতূহল আমাদের সকল সংবেদনশীলতা যেন ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছিল। আমাদের সন্ধানী চোখ তাঁকে যে কতটা বিব্রত, উৎপীড়িত করল, সেটা যেন আমরা বেমালুম ভুলে গেলাম। সেই সঙ্গে দেখা গেল যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরাও স্পষ্ট করে বলতে পারলেন না, তাঁর লিঙ্গ কী? প্রয়োজন পড়ল জটিল ল্যাবরেটরির পরীক্ষা-নিরীক্ষার। এই কনটেক্সটেই আমরা বুঝতে চাইব সেক্স কী এবং বুঝতে চাইব তার জটিলতা। দ্বিতীয় অংশে আসবে জেন্ডারের কথা।

জন্মমুহূর্ত থেকেই আমরা শিশুর সেক্স কী, বুঝে যাই। বুঝে যাই শিশুর যৌনাঙ্গ দেখে। ছেলের থাকবে শিশ্ন ও অণ্ডাশয় (যাতে থাকে দু'টো অণ্ডকোষ), আর মেয়ে হলে তার থাকবে যোনি। হাসপাতালের প্রসূতি-কক্ষের সামনে উৎসুক বাবা বা আত্মীয়স্বজনকে ডাক্তার বা নার্সরা সর্বাঙ্গ কাপড়ে ঢাকা শিশুর এই অঙ্গগুলোই দেখিয়ে থাকেন। যা দেখে আমরা নিশ্চিত হই। নিশ্চিত হয়ে সকলকে জানাই। কী হয়েছে? ছেলে না মেয়ে? এটা দু'টো স্পষ্ট খোপ বা বর্গ। এই দুই 'স্বাভাবিক' ও অটুট ভাগে ভাগ হয়ে আছে সমগ্র মানবজাতি। স্কুলপাঠ্য জীবনবিজ্ঞান আমাদের এমনটাই শিখিয়ে এসেছে।

সেক্স বা লিঙ্গকে আমরা দুই এবং কেবল মাত্র দুটো বলেই অনেকে জানি। এক দিকে আছে পুং-লিঙ্গ— যার বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। অপর দিকে আছে স্ত্রী-লিঙ্গ— যে আবার ভিন্ন শারীরিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। পুং-লিঙ্গ এবং স্ত্রী-লিঙ্গ এই দুই বিপরীত লিঙ্গের ধারণাই আমাদের বেশিরভাগ মন ও মননকে অধিকার করে রয়েছে। কিন্তু বাস্তব একটু অন্য রকম কথা বলে। এই দুই লিঙ্গের দৈহিক— বহিরঙ্গ বা অন্তরঙ্গ উভয়— বৈশিষ্ট্যগুলোকেই যদি আদর্শ ধরে নিই, তা হলেও দেখতে পাই মানবও অপরাপর না-মানব জীবের ক্ষেত্রেও রয়েছে এই আদর্শের অন্তর্বর্তী (ইন্টার সেক্স) বা তারও বাইরের অনেকানেক লিঙ্গ বৈশিষ্ট্য। আজকের জীববিজ্ঞানের বয়ান অনুযায়ী এমনটা ভ্রূণ অবস্থাতেই নির্ধারিত হয়ে যায় এবং তা তিন প্রকারের কারণ থেকে ঘটে থাকতে পারে— ক্রোমোজোমের পরিবর্তন, প্রজনন তন্ত্রের পরিবর্তন বা কেবল

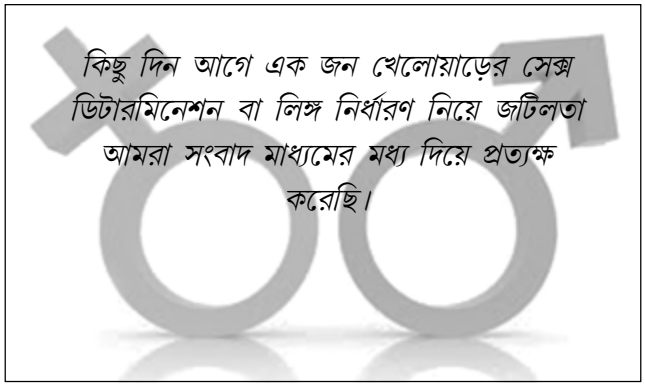

জননাঙ্গের গঠনগত পরিবর্তন। যার ফলে দেখা দেয় সেক্স রিভার্সাল, অ্যাম্বিগুয়াস জেনিটালিয়া। অর্থাৎ, বিপরীত লিঙ্গের সমাহার, অস্পষ্ট যৌনাঙ্গ অথবা লিঙ্গ বৈশিষ্ট্যের গঠনগত নানান পার্থক্য।

একজন ব্যক্তির সেক্স নির্ধারিত হয় কতগুলো লিঙ্গ বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে। একটু সরল করে বললে সেগুলো হল প্রাথমিক লিঙ্গ বৈশিষ্ট্য যেমন পুরুষের থাকবে শিশ্ন বা পুরুষাঙ্গ ও অণ্ডাশয়, আর নারীর থাকবে যোনি এবং শরীর অভ্যন্তরে জরায়ু-ডিম্বাশয় সহ আরও কিছু দেহাংশ। গৌণ লিঙ্গ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পড়ে ত্বকে লোমের উপস্থিতির তারতম্য, যেমন নারীর বিশেষ কিছু অঞ্চল বাদে শরীরে লোম পুরুষের তুলনায় বেশ কম; পুরুষের দাড়ি-গোঁফ তাকে নারীর থেকে পৃথক করে দেয়। এছাড়াও গলার স্বরের তারতম্য দেখা যায়, যেমন পূর্ণবয়স্ক নারীর স্বর হয় মিহি, তুলনায় পুরুষের হয় ভারী। এ ছাড়া, শারীরিক গঠনগত তফাতও দেখা যায়। রয়েছে নারী ও পুরুষের হরমোনের পরিমাণগত তারতম্যও। এছাড়া ক্রোমোজোমের তফাত থেকে নির্ধারিত হয় জেনেটিক সেক্স।

শিশুর জেনেটিক সেক্স বা ক্রোমোজোম-নির্দিষ্ট লিঙ্গ ভ্রূণাবস্থায়ই নির্ধারিত হয়ে যায়। আমরা স্কুলের জীবনবিজ্ঞানের পাঠেই পড়েছিলাম যে, মায়ের ডিম্বাণুতে থাকে ২২টি ক্রোমোজোমের সঙ্গে একটি X ক্রোমোজোম এবং বাবার শুক্রাণুতে থাকে ২২টির সঙ্গে হয় X বা Y ক্রোমোজোম। X ও Y ক্রোমোজোমকে বলা হয় সেক্স ক্রোমোজোম। নিষেকের সময় যখন ডিম্বাণু ও শুক্রাণু মিলিত হয় তখনই শিশুর জেনেটিক সেক্স নির্ধারিত হয়ে যায়। সাধারণত, একটা শিশু এক জোড়া সেক্স ক্রোমোজোম উত্তরাধিকার সূত্রে পায়— একটা X মায়ের কাছ থেকে এবং একটা X বা একটা Y বাবার কাছ থেকে। তা হলে দেখা যাচ্ছে সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণে পিতাই শেষ কথা। তবুও আমরা আমাদের সমাজে কন্যা সন্তান প্রসব করার জন্য মায়েদের দায়ী করি, নিপীড়ন করি। এটা একটা শরীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া, যা পিতা বা মাতার ইচ্ছা-নিরপেক্ষ। পিতার কাছ থেকে যে শিশু X ক্রোমোজোম পায় সে হল জেনেটিক কন্যা সন্তান (২২ জোড়া + XX) এবং যে পিতার কাছ থেকে Y ক্রোমোজোম পায় সে জেনেটিক পুত্র সন্তান (২২ জোড়া + XY)। মানব শরীরে সাধারণত ক্রোমোজোমের এই ধরনের বিন্যাসই দেখা যায়। স্কুলপাঠ্য সাধারণত আমাদের এখানেই সীমিত রাখে। আমরা বেশির ভাগ একেই সর্বৈব সত্য ও স্বাভাবিক বলে ধরে নিই। কিন্তু প্রকৃতির রঙ্গমঞ্চে এই বিন্যাসের হরেক কিসিমের রকমফেরও ঘটে থাকে। আবার এই সঙ্গে আর একটা কথাও মনে রাখতে হবে যে, চিকিৎসা বিজ্ঞান অনুসারে, ভ্রূণের একই টিস্যু বা কলা থেকেই পুং ও স্ত্রী রিপ্রোডাক্টিভ অর্গ্যান বা প্রজনন অঙ্গ ও যৌনাঙ্গ তৈরি হয়।

আমরা আমাদের সমাজে কন্যা সন্তান প্রসব করার জন্য মায়েদের দায়ী করি, নিপীড়ন করি। এটা একটা শরীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া, যা পিতা বা মাতার ইচ্ছা-নিরপেক্ষ।

যে প্রক্রিয়া ভ্রূণের এই পুং বা স্ত্রী বৈশিষ্ট্য তৈরি করে সেখানে যদি কোনও অদল-বদল হয়, যেমনটা অনেক সময় হয়েই থাকে, তবে অস্পষ্ট যৌনাঙ্গ দেখা দিতে পারে। এমন যৌনাঙ্গ যা দেখে সাধারণ চোখ শুধু নয়, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরাও ঠাহর করতে পারেন না সে পুং না স্ত্রী লিঙ্গের অধিকারী। এবং এই অস্পষ্টতার মাত্রাও নানান রকম হয়। কিছু কিছু দুর্লভ ক্ষেত্রে, এমনটা হতে পারে যে বাইরে দেখতে সে যে লিঙ্গের তার জেনেটিক লিঙ্গ হয়ত সম্পূর্ণ বিপরীত। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, একজন জেনেটিক পুরুষের বহিরঙ্গ সম্পূর্ণভাবেই স্ত্রী-সুলভ হয়ে উঠতে পারে। চিকিৎসাশাস্ত্র অনুসারে এ প্রসঙ্গে যে বয়ান রয়েছে, তা যথাযথ ধরে নিয়ে, সংক্ষেপে তার বর্ণনা করলে যেমনটা দাঁড়ায়—

জেনেটিক স্ত্রী (যে শিশুর এক জোড়া X ক্রোমোজোম বর্তমান)-র অস্পষ্ট যৌনাঙ্গ :

(ক) একটা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ক্লিটোরিস যা দেখতে ক্ষুদ্র লিঙ্গের মতো।

(খ) মূত্রছিদ্র ক্লিটোরিসের শেষে, উপরে বা নিচে অবস্থিত হতে পারে।

(গ) লেবিয়া (যোনির দু'পাশের ওষ্ঠের মতো আচ্ছাদন) জুড়ে গিয়ে অণ্ডাশয়ের মতো দেখতে হতে পারে।

(ঘ) শিশুটাকে পুং-সন্তান বলে মনে হতে পারে, যার অণ্ডকোষ পেটের ভেতর থেকে অণ্ডাশয়ে নেমে আসেনি।

যে প্রক্রিয়া ভ্রূণের এই পুং বা স্ত্রী বৈশিষ্ট্য তৈরি করে সেখানে যদি কোনও অদল-বদল হয়, যেমনটা অনেক সময় হয়েই থাকে, তবে অস্পষ্ট যৌনাঙ্গ দেখা দিতে পারে। এমন যৌনাঙ্গ যা দেখে সাধারণ চোখ শুধু নয়, বিশেষজ্ঞ চিকিসকরাও ঠাহর করতে পারেন না সে পুং না স্ত্রী লিঙ্গের অধিকারী।

(ঙ) আবার কখনও কখনও জুড়ে যাওয়া লেবিয়ার মধ্যে মাংসপিণ্ড অনুভূত হতে পারে, যাকে অণ্ডকোষ সমেত অণ্ডাশয় বলে ভ্রম হতে পারে।

জেনেটিক পুং (যে শিশুর একটা করে X ও Y ক্রোমোজোম থাকে)-এর অস্পষ্ট যৌনাঙ্গ :

(ক) ক্ষুদ্র লিঙ্গ (২-৩ সে.মি.-এর কম দৈর্ঘ্যের) যা দেখে বড় ক্লিটোরিস বলে মনে হতে পারে (সদ্যোজাত কন্যা শিশুর ক্লিটোরিস সাধারণত একটু বড়ই থাকে)।

(খ) মূত্রছিদ্র লিঙ্গের শেষে, ওপরে বা একদম তলায় হতে পারে। ফলে তাকে কন্যা শিশু বলেই মনে হতে পারে।

(গ) অণ্ডাশয় জুড়ে না গিয়ে বিচ্ছিন্ন হতে পারে, ফলে মনে হতে পারে তা লেবিয়া।

(ঘ) অস্পষ্ট যৌনাঙ্গের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ সময়ই অণ্ডকোষ পেটের ভেতর থেকে অণ্ডাশয়ে নেমে আসে না।

অস্পষ্ট যৌনাঙ্গের কারণ :

১। সিউডোহার্মাফ্রোডাইটিজম বা ছদ্ম উভলিঙ্গতায় (যদিও এমন নামকরণ মেডিসিন আর ব্যবহার করে না) যৌনাঙ্গ কোনও এক সেক্স বা লিঙ্গের, কিন্তু কিছু শারীরিক বৈশিষ্ট্য অপর লিঙ্গের মতো। যেমন, এক জনের হয়ত যোনি রয়েছে, কিন্তু তার বাহ্যিক দৈহিক বৈশিষ্ট্য থেকে তাকে পুরুষ বলেই মনে হয়।

২। ওভোটেসটিক্যুলার : এটা বেশ দুর্লভ, যেখানে একই দেহে ডিম্বাশয় ও অণ্ডকোষের কোষ-কলা যুগপৎ বর্তমান। আবার একই সঙ্গে তার পুং ও স্ত্রী যৌনাঙ্গের অংশও থাকতে পারে।

৩। মিক্সড গোনাডাল ডিসজেনেসিস : এটা একটা অন্তর্বর্তী অবস্থা, যেখানে শরীরে থাকে পুরুষের প্রজনন অঙ্গ, অর্থাৎ অণ্ডকোষ এবং সেই সঙ্গে জরায়ু, যোনি ও ফ্যালোপিয়ান টিউব।

৪। কনজেনিটাল অ্যাড্রিনাল হাইপারপ্লাসিয়া— জন্মগতভাবে বড় ও অতি সক্রিয় অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি। এই অবস্থাটা সাধারণত জীবনসংশয়ী। এর বিভিন্ন রকমফের দেখা দিতে পারে। তবে সচরাচর দেখা যায় জেনেটিক স্ত্রী লিঙ্গের শিশু পুং শিশুর রূপ নিয়ে দেখা যায়।

৫। ক্রোমোজোমের পার্থক্য, যেমন ক্লিনফেল্টারস্ সিনড্রোম (XXY)—যার তিনটে সেক্স ক্রোমোজোম থাকে। টার্নারস্ সিনড্রোম (XO)—যার কেবল একটাই X ক্রোমোজোম থাকে।

৬। গর্ভাবস্থায় মা যদি কিছু ওষুধ খেয়ে থাকেন (যেমন, অ্যান্ড্রোজেনিক স্টেরয়েড), তাহলে জেনেটিকালি স্ত্রী-লিঙ্গের শিশু পুরুষালি চেহারা নিয়ে ভূমিষ্ঠ হতে পারে।

৭। কিছু হরমোনের স্বল্প উৎপাদনের ফলেও ভূমিষ্ঠ শিশু স্ত্রী-সুলভ চেহারা নিয়ে জন্মাতে পারে, তা তার জেনেটিক লিঙ্গ যাই হোক না কেন।

৮। টেস্টোস্টেরন-এর মতো কিছু হরমোনের রিসেপ্টর লেভেলে সমস্যা থাকলে জেনেটিক পুং শিশু স্ত্রী-সুলভ আদল নিয়ে হাজির হতে পারে।

অস্পষ্ট যৌনাঙ্গ সাধারণত কোনও জীবন সংশয়ের কারণ নয়। কিন্তু, অস্পষ্ট যৌনাঙ্গ সেইসব শিশু বা মানুষের ও তাদের পরিবার-পরিজনের পক্ষে সামাজিক সমস্যার কারণ হয়ে ওঠে।

অস্পষ্ট যৌনাঙ্গ সাধারণত কোনও জীবন সংশয়ের কারণ নয়। কিন্তু, অস্পষ্ট যৌনাঙ্গ সেইসব শিশু বা মানুষের ও তাদের পরিবার-পরিজনের পক্ষে সামাজিক সমস্যার কারণ হয়ে ওঠে। কারণ, তাঁদের ছেলে বা মেয়েকে এই দুই অটুট খোপে ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। আবার সেই সঙ্গে বয়ে আসে আশঙ্কা, এই শিশুরা হয়তো প্রজননে অক্ষম। এই আশঙ্কা কেবল পরিবার-পরিজনের নয়, বিজ্ঞানেরও তা বড় মাথা ব্যথার কারণ। সন্তান উৎপাদনশীলতা বা প্রজনন-সক্ষমতা এক আদর্শায়িত অবস্থান, যার বিচ্যুতি অসহনীয়। এই আদর্শের চাপ আমাদের ওপর এমন ভাবে চেপে বসে আছে, আমাদের মন মননকে এমন আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে যে, অন্যথা হলেই আমরা বেশ নড়েচড়ে বসি। বিচ্যুতকে চ্যুতি সারিয়ে হয় পথে আনতে চাই, নচেৎ, 'অস্বাভাবিক' 'বিকৃত' 'অনিষ্টকর' তকমা সেঁটে প্রান্তে ঠেলে দিই। যে জীবন সন্তান উৎপাদনে অক্ষম সে জীবন তো ব্যর্থ--- বংশের বাতি জ্বালিয়ে রাখবে কে? 'রক্ত-জল-করে' সঞ্চয় করা সম্পদ কে ভোগ করবে? বৃদ্ধ বয়সে কে দেখাশোনা করবে? মনুষ্য প্রজাতির কী হবে? এমন সব বাঘা বাঘা প্রশ্নের বাণ তূণ থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসে। সে সব প্রশ্নের মোকাবিলা করা বা এই বিষয়ে আলোচনা আরও বিস্তৃত ও ভিন্ন পরিসরের দাবি রাখে। আর একটা স্ববিরোধের কথা না বলে পারছি না। ব্রহ্মচর্য, মানে যেখানে একজন স্বেচ্ছায় সন্তান উৎপাদন থেকে বিরত, তা আবার অনেক সমাজের মতো আমাদের সমাজেও সর্বোত্তম হিসেবে স্বীকৃত।

আরও একটা বিষয় উল্লেখ্য যে, আমাদের সমাজ-মননে আছে অন্য রকমের নিয়ে এক অদম্য কৌতূহল। কখনও সে কৌতূহল এমনই অসংযমী, অসংবেদি, ভয়ঙ্কর যে তা হয়ে উঠতে পারে এমন কি প্রাণঘাতীও। পূর্ব উল্লিখিত খেলোয়াড়ের সেক্স বা লিঙ্গ নিয়ে আমাদের বাঁধভাঙা কৌতূহল তারই সাক্ষ্য বহন করে।

বিজ্ঞান যদিও লিঙ্গের বহুত্ব স্বীকার করে কিন্তু কার্যক্ষেত্রে বার বার সে নারী ও পুরুষ কেবল এই দুই লিঙ্গের খোপের মধ্যেই সকল লিঙ্গ সত্ত্বাকে পুরে দিতে চায়।

আমরা বিজ্ঞানের বয়ান থেকেই দেখতে পাচ্ছি, নারী ও পুরুষ এই দুই ধরনের লিঙ্গ সত্ত্বা ব্যতিত হতে পারে অসংখ্য জানা-অজানা লিঙ্গ সত্ত্বা; যারা কখনওই নারী ও পুরুষের চেনা দুই খোপের মধ্যে খাপ খায় না। বিজ্ঞান যদিও লিঙ্গের বহুত্ব স্বীকার করে কিন্তু কার্যক্ষেত্রে বার বার সে নারী ও পুরুষ কেবল এই দুই লিঙ্গের খোপের মধ্যেই সকল লিঙ্গ সত্ত্বাকে পুরে দিতে চায়। এমনকি তার বহুত্বের মধ্যেও বেশির ভাগ সময়ই থাকে এই দুই লিঙ্গসত্ত্বার

আধিপত্য এবং অনেক ক্ষেত্রেই অপরাপর লিঙ্গ সত্ত্বাকে সে বিচ্যুত, বিকৃত, অস্বাভাবিক, অপ্রাকৃত বলে বর্ণনা করে থাকে। অস্পষ্ট যৌনাঙ্গ নিয়ে জন্মানো শিশুর সেক্সও চিকিৎসকরা তাই জন্ম মুহূর্তেই ঠিক করে দিয়ে থাকেন। প্রয়োজনে অপারেশন করে তার স্ত্রী/পুং লিঙ্গ নির্মাণ করে দেন। অপরাপর লিঙ্গসত্ত্বা নিয়ে তাই প্রশ্ন রয়ে যায় :

তাদের লিঙ্গ পরিচয় কী হবে?

তাদের কি জোর করে কোনও একটা খোপে পুরে দিতেই হবে?

তাদের আকাঙ্ক্ষা কি সামাজিক ভাবে অস্বীকৃত থাকবে বা প্রয়োজনে পদদলিত হবে?

প্রশ্নগুলোকে আর এড়িয়ে যাওয়া বা পাশে সরিয়ে রাখা যাচ্ছে না। আমাদের জানা বোঝার সংকীর্ণতা একদেশদর্শিতা ছেড়ে বেরিয়ে আসার সময় এসেছে। ঐতিহাসিকভাবে দেখলে দেখতে পাব দেশ-কাল-নির্বিশেষে এই না-পুরুষ ও না-নারী লিঙ্গের পরিচয় মানুষের ছিল। কোনও কোনও সংস্কৃতিতে তাদের সকলকে এক সঙ্গে 'তৃতীয় লিঙ্গ'-এর দলে ফেলা হয়েছে। আবার বেশির ভাগ সমাজ-সংস্কৃতিতে তাদের হয় পুরুষ, না-হয় নারী পরিচয় নিয়েই বাঁচতে হয়েছে। হিন্দু পুরাণে যেমন পাই শিখণ্ডী-র কথা, তেমনি আবার অর্ধনারীশ্বর কল্পনার কথা। সুমেরীয় মিথ অনুযায়ী ভগবান এমন লিঙ্গ সত্ত্বা সৃষ্টি করলেন যার না আছে পুরুষাঙ্গ, না যোনি এবং ভগবানেরই বিধান অনুসারে তাঁর অবস্থান হয় রাজার আসনের সামনে। কোনও কোনও যুগে বা সমাজে এমন মানুষেরা সম্মানিত, আদরণীয়; আবার কোথাও বা তারা নির্যাতিত, প্রান্তে নিক্ষিপ্ত। তাই আজ এই এক বিংশ শতাব্দীতে এসে দাবিটা নতুন করে উঠতে থাকে যে, তামাম লিঙ্গ সত্ত্বার পরিচয়গুলোকে আমাদের জানা-চেনা স্বাভাবিকতা বা আদর্শের সংকীর্ণ খোপে পুরে দেওয়ার ঊর্ধ্বে ওঠা দরকার। স্ত্রী ও পুরুষ এই দুই লিঙ্গ সত্ত্বায় সীমিত না থেকে সকল বিদ্যমান বা সম্ভাব্য লিঙ্গ সত্ত্বাকেই তার প্রাপ্য সমমর্যাদায় সমান পরিসর দিতে পারা জরুরি, কোনও উঁচু নীচুর হায়ারার্কি না রেখেই। তাই প্রয়োজন অদল-বদল ঘটানো আমাদের ভাষা-ভাষ্য, সমাজ কাঠামো, ভাবনা কাঠামোয়। বদলগুলো, সংশোধনগুলো বড্ড জরুরি। উদাহণস্বরূপ বলা যায়, লেডিস বা জেন্টস এই দুই জল-অচল বর্গের লেবেলের বাইরে বেরনো যায়, কিংবা হাসপাতাল কারাগার ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলোতে মেল-ফিমেল ওয়ার্ডের দ্বৈত বিভাজনকে যদি একটু আলগা বা অস্পষ্ট করতে পারা যায় তা হলে হয়তো সকলের জন্য স্থান সংকুলান হয়। কিন্তু শুধুই প্রবেশদ্বারের ওপরে বা প্রতিষ্ঠানগুলোর স্থাপত্যে পরিবর্তন যথেষ্ট নয়, অনুসারি পরিবর্তন চাই আমাদের মননে এবং বোধেও।

যে আলোচনাটা বাদ পড়ে গেল তা হল সেক্স নামক ধারণাটার ঐতিহাসিকতা। সেক্স-এর ধারণাও দেশ-কাল নির্বিশেষে এক নয়। যদি ইওরোপের দিকেই তাকাই তা হলেও দেখব আজ আমরা সেক্সের যে বাইনারি বা দ্ব্যনুকের ওপর আমাদের সকল আস্থা, বিশ্বাস, ভরসা অর্পণ করে বসে আছি তার বয়সও বড়জোর আড়াইশো-তিনশো বছর। তার আগে

সেক্স কারণ হলে জেন্ডার তার প্রকাশ, ফল। তাই পুরুষকে হতে হবে পুরুষালি, আর মেয়েদের মেয়েলি।

ছিল অন্য রকম সেক্সের ধারণা। সুতরাং আজকের সত্যের ভিতও নড়ে যেতে পারে। এটা ভুলে গেলে বা ভুলে থাকলে চলবে না।

এ তো গেল সেক্স বা জৈবিক লিঙ্গের কথা। এবার একটু দেখে নিই জেন্ডারের ছবিটা। জেন্ডার বা সামাজিক লিঙ্গ হল এক সামাজিক নির্মাণ। প্রত্যেক সমাজ নারী ও পুরুষের ব্যবহারে চাপিয়ে দেয় এক ধরনের বিধিবদ্ধতা। এ এক প্রকার সামাজিক প্রেসক্রিপশন। যার ভিত হল তার সেক্স। সেক্স কারণ হলে জেন্ডার তার প্রকাশ, ফল। তাই পুরুষকে হতে হবে পুরুষালি, আর মেয়েদের মেয়েলি। এর অন্যথা হওয়ার জো নেই। প্রায় প্রত্যেক সমাজ-সংস্কৃতি নারী ও পুরুষ ভূমিকা নির্দিষ্ট করে দেয়। পোষাক-পরিচ্ছদ, চলন-বলন, ধর্মীয় ক্রিয়া-কর্ম, শ্রমের মতো নানান বিষয় হল তার নির্দেশক। প্রায় সকল সংস্কৃতিই ধরে নেয় যে পুরুষ হবে যুক্তিশীল, সাহসী, আগ্রাসী, আত্মসচেতন। সে হবে রক্ষক। উল্টোদিকে নারী হবে লজ্জাশীলা, গ্রহীতা, নির্ভরশীলা, যত্নশীলা। হয়ত কোনও এক ঐতিহাসিক লগ্নে সমাজের মসৃণ চলার জন্য এমনটা ভাবা হয়েছিল। যার মূলে রয়ে গেছে শ্রমের যৌন বিভাজন।

সেক্সকে যেমন আমরা দু'টো সম্পূর্ণ পৃথক ভাগে ভাগ করে ফেলি তেমনি সেক্স থেকে উৎসারিত বলে ধরে নেওয়া জেন্ডারকেও দুই পৃথক বর্গ হিসেবে আমরা দেখতে অভ্যস্ত। আমরা আজ শিশুদের পোষাকের রংও কেবল দু'টোতে, পিংক (শিশু কন্যার জন্য) আর ব্লু (শিশুপুত্রের জন্য)-তে, ভাগ করে ফেলেছি। মিডিয়া, বিশেষ করে ইলেকট্রনিক মিডিয়া, নারীত্ব ও পৌরুষকে আজ আরও তীব্রভাবে এক ছাঁচে-ঢালা চেহারা দিয়ে চলেছে। একজন মেয়ের নারী সুলভ হয়ে ওঠা এবং উল্টোদিকে একজন ছেলের পুরুষ হয়ে ওঠা এক সামাজিক নিয়ম। তার বড় হয়ে ওঠার অবশ্যপালনীয় কর্তব্য। মেয়ে হলে মেয়েদের মতো পোশাক পরতে হবে, সাজতে হবে, লম্বা চুল রাখতে হবে বা মেয়েদের মতো ছাঁট দিতে হবে, কথাবার্তা আদব-কায়দায় মেয়েদের মতো হতে হবে। পারলে বালিকা বিদ্যালয়ে যেতে হবে, মেয়েদের জন্য সুবিধাজনক এমন সাবজেক্টে অনার্স করতে হবে। বাড়ির পছন্দ করা ছেলেকে বিয়ে করে সুখে সংসার করবে। সন্তানের জন্ম দিয়ে ভাল মা হয়ে উঠবে। আর আছে না-এর পাহাড়। এরকম করে বোসো না, ওভাবে হেসো না, বেশি দাবি-দাওয়া করো না, রাত করে ফিরো না, রাতে বাড়ির বাইরে কিছুতেই থেকো না, ছেলেদের মতো হয়ো না। মেয়ে হয়ে মেয়েকে ভালবেসো না। এ সব যদি করতে পারা যায় তা হলে সে সমাজে আদর্শ নারী। তেমনি পুরুষের জন্যও আছে এমন দীর্ঘ ফর্দ। যেসব আমাদের সকলেরই জানা। এমনটা মেনেই তাকে আদর্শ পুরুষ হতে হয়। এমন নিয়ম-কানুন আমরা মেনে চলি। মেনে চলতে শিখি, শেখাই। কারণ এসব নিয়মে বিধিনিষেধে আমাদের অগাধ আস্থা-ভরসা। নিয়মের সামান্য এদিক-ওদিক হয়তো মেনে নেওয়া যেতে পারে। যেমন, মেয়ে হয়ে ছেলেদের পোশাক পরা যেতে পারে বা ছেলেরাও মেয়েদের মতো চুড়িদার ও উত্তরীয় পরে ঘুরতে পারে। ছেলেদের কর্মস্থলে

এরকম করে বোসো না, ওভাবে হেসো না, বেশি দাবি-দাওয়া করো না, রাত করে ফিরো না, রাতে বাড়ির বাইরে কিছুতেই থেকো না, ছেলেদের মতো হয়ো না। মেয়ে হয়ে মেয়েকে ভালবেসো না। এসব যদি করতে পারা যায় তা হলে সে সমাজে আদর্শ নারী।

মেয়েদের প্রবেশ তো ঘটেছেই, তাই বলে ছেলেরা যেন প্রান্তে না চলে যায়। ছেলেরা শখে রান্না করতেই পারে, তাই বলে ঘরকন্নার দায়িত্ব সে নিতে পারে না। অর্থাৎ, সীমা ছাড়িয়ে গেলে চলবে না।

তারপরও অনেক বেয়াড়া তো রয়েই যায়। তারা এই বিভাজন মানে না, মানতে পারে না। রূপান্তরকামী বা ট্রান্সজেন্ডার মানুষরা হল এমন মানুষ, যারা সেক্স-জেন্ডারের এই একমুখী কার্যকারণ সম্পর্ক এবং জেন্ডারের জল-অচল আপাত স্থিতিকে প্রশ্নের মুখে ফেলে দেয়, তার ভিতকে টলিয়ে দেয়। একজন জৈবিক পুরুষ নারী হয়ে বাঁচতে চায়, আবার উল্টে একজন জৈবিক নারী পুরুষ হয়ে জীবন কাটাতে চায়। জন্মের পর থেকে নিজেদের ওপর চেপে বসা জেন্ডার পরিচিতি তারা মেনে নিতে পারে না। তারা অপর জেন্ডারের মতো হতে চায়। হয়ে সুখে-শান্তিতে বাঁচতে চায়। কিন্তু তাতে পরিবার-পরিজন, সমাজ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। প্রকৃতির দোহাই দিয়ে, ধর্মের ভয় দেখিয়ে, নিজেদের ভালো-মন্দ লাগাগুলো চাপিয়ে দিয়ে, অনাগত ভবিষ্যতের জুজু দেখিয়ে বশে আনতে চায়। ডাক্তার দেখিয়ে 'রোগ' সারিয়ে তুলতে চায়। না মানলে বা বলা ভাল না মানতে পারলে অকথ্য গালিগালাজ, শারীরিক অত্যাচার, বাড়ি থেকে, স্কুল থেকে বা কাজের জায়গা থেকে বিতাড়ন। এক কথায় একঘরে করে দেওয়া। খুব মারাত্মক হলে মেরেই ফেলা। কিন্তু এত সব কিছু সত্ত্বেও কিছু মানুষ আড়ালে-আবডালে বা প্রকাশ্যে রূপান্তরকামী হয়, রূপান্তরকামী হয়ে বাঁচে।

এ কোনও মুহূর্তের শখের বিষয় নয়। এভাবে বাঁচার তাড়না বা তাগিদ এমনই নাছোড়বান্দা যে সকল অত্যাচার অপবাদের সামনেও সে নিরুপায়। নিজেদের পছন্দের জেন্ডার পরিচয় ছাড়া তার কাছে বাঁচার কোনও অর্থই যেন নেই। যদিও এই নারীর পুরুষ হয়ে ওঠা বা পুরুষের নারী হয়ে ওঠার মধ্যে তীব্রতার তারতম্য ঘটে। কোনও নারী হয়ত কিছুটা পুরুষ হয়েই দিব্যি থাকে। আবার কোনও মানুষ হয়তো শরীরে নারী, কিন্তু ছোটবেলা থেকেই সে কেবল পুরুষ সাজসজ্জাতেই সীমিত না থেকে শরীরেও পুরুষ হয়ে উঠতে চায়। আবার কোনও পুরুষ হয়তো সম্পূর্ণভাবে নারী হয়ে উঠতে চায়। এমন মানুষরা জন্ম থেকে পাওয়া সেক্সুয়াল বডিটা আর বইতে চায় না, তার মধ্যে তাদের যেন দম বন্ধ হয়ে আসে। সে তার সেক্স পাল্টে ফেলতে চায়। নানান তরিকার আশ্রয় নেয় সে। আজকের আধুনিক চিকিৎসার সাহায্যে সে নিজেকে প্রায় সম্পূর্ণত পাল্টেও ফেলতে চায়। যদিও চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রকৌশল অতীব খরচসাপেক্ষ। নানা কারণে এই মানুষগুলো গরিব হওয়ায় তারা এই ব্যয়বহুল চিকিৎসা করিয়ে উঠতে পারে না। তবুও কোনও কোনও ভাগ্যবান / ভাগ্যবতী সে সুযোগ পায়। যুগ যুগ ধরে বহু নারী যেমন নানাভাবে চেষ্টা করে পুরুষ হতে চেয়েছে, তেমনি বহু পুরুষ মানুষ পুরুষাঙ্গ ছেদন করে বা অন্যান্য ভাবে চেষ্টা করেছে নারী হওয়ার। এমন ভাবে যারা সেক্স বদলে ফেলে তাদের আমরা বলি ট্রান্সসেক্সুয়াল। আমাদের সমাজে হিজড়েদের মধ্যে তাদের সংখ্যা প্রচুর। কিন্তু আমরা অনেকেই অজ্ঞানতাবশত রূপান্তরকামী সকল মানুষকেই হিজড়েদের সঙ্গে এক বন্ধনীতে ফেলে দেখতে অভ্যস্ত।

এখানে হিজড়েদের প্রসঙ্গে কয়েকটা কথা বলে নেওয়া আবশ্যক। আমরা সাধারণত আমাদের নির্ধারিত আদর্শ সেক্স বা জেন্ডারের মধ্যে যারা পড়ে না তাদের সকলকেই আমরা এমন গোষ্ঠীর সঙ্গে এক করে দেখি। কারণ আমাদের আদর্শ নারী-পুরুষের বাইরে এদের সঙ্গেই আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ হয়। হিজড়ে কোনও সমসত্ত্ব গোষ্ঠী নয়। এ হল এক সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, যাদের মধ্যে থাকে রূপান্তরকামী বা ট্রান্সজেন্ডার, ট্রান্সসেক্সুয়াল, লিঙ্গ ছেদন করা নপুংসক, ইন্টারসেক্স এমন কি সোজাসাপটা নারী ও পুরুষও। তারা এক বিশেষ প্রান্তিক অঞ্চলে বসবাস করে, যার নাম খোল। তারা ভিক্ষা করে বা সদ্যোজাতের বিশেষ ধর্মীয় আচারের মতো কিছু কাজকর্ম করে দিন গুজরান করে। যদিও কথিত তারা নাকি সমাজে এক কালে উচ্চাসনে ছিল। কিন্তু আজ তারা সমাজে প্রায় পতিত। সমাজের চোখে তারা বিচ্যুত; সমাজের

যারা সেক্স বদলে ফেলে তাদের আমরা বলি ট্রান্সসেক্সুয়াল। আমাদের সমাজে হিজড়েদের মধ্যে তাদের সংখ্যা প্রচুর। কিন্তু আমরা অনেকেই অজ্ঞানতাবশত রূপান্তরকামী সকল মানুষকেই হিজড়েদের সঙ্গে এক বন্ধনীতে ফেলে দেখতে অভ্যস্ত।

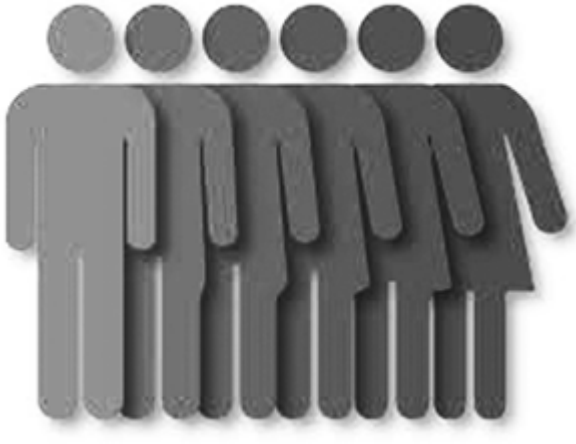

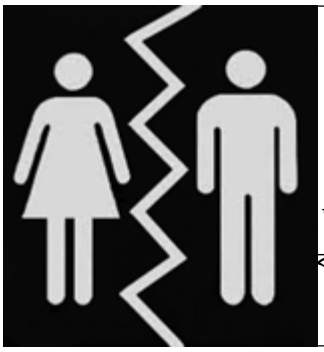

কিন্তু প্রশ্ন হল এই হিজড়ে, রূপান্তরকামী, ইন্টারসেক্স, ট্রান্সসেক্সুয়াল মানুষরা তো কারও ক্ষতি করছে না। তারা তাদের মতো জেন্ডার নির্বাচন করে নিজের মতো সুহৃদ বেছে নিয়ে দিব্যি থাকতে চায়।

নির্ধারিত সেক্স / জেন্ডারের আদর্শ বা রীতি-নীতিকে তারা তোয়াক্কা করে না। সেই কারণে তারা পতিত। পতিত হওয়ার কারণে তারা প্রান্তিক, মান্য সামাজিকদের চোখের আড়ালে তাদের অবস্থান। রাষ্ট্রের কাছেও সে প্রান্তিক। তাদের প্রান্তিকতা তাদের সকল সামাজিক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে। তারা যথেষ্ট নাগরিক হয়ে ওঠে না। তাই তারা যেমন সামাজিক ভাবে বঞ্চিত, তেমনই অর্থনৈতিক ভাবেও তাদের পঙ্গু করে রাখা হয়েছে। অশিক্ষা, বঞ্চনা, দারিদ্রের মতো বিষয়গুলো তাদের নানারকম অসামাজিক অনৈতিক কাজেও জড়িয়ে পড়তে সামাজিক ভাবে বাধ্য করে।

কিন্তু প্রশ্ন হল এই হিজড়ে, রূপান্তরকামী, ইন্টারসেক্স, ট্রান্সসেক্সুয়াল মানুষরা তো কারও ক্ষতি করছে না। তারা তাদের মতো জেন্ডার নির্বাচন করে নিজের মতো সুহৃদ বেছে নিয়ে দিব্যি থাকতে চায়। এরা যে সকলে অকম্মা, নির্বোধ, বদমায়েস এমনটাও নয়। বহু রূপান্তরকামী মানুষ বিশ্বের দরবারে নিজগুণে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। যেমন, স্বয়ং ঋতুপর্ণ ঘোষ। পুরাণ অনুযায়ী, মহাভারতে মহাবীর অর্জুন বৃহন্নলা হয়ে বিরাট রাজ্যে অজ্ঞাতবাসে ছিলেন। কিন্তু তাতে তিনি পতিত হয়ে যাননি। আমাদের দেশেই এক উপাসক সম্প্রদায় ছিলেন যেখানে পুরুষরা রাধা হয়ে অর্থাৎ, নারীরূপে থাকতেন এবং কৃষ্ণের উপাসনা করতেন। তারা যেমন জ্ঞানী ছিলেন সমাজে তারা সম্মানের অধিকারীও ছিলেন। কিন্তু কিছুদিন আগেই উত্তর প্রদেশে এক পুলিশ অফিসার নারীবেশে থানায় যাওয়ার জন্য তাঁর ওপর রাষ্ট্রীয় শাস্তির খাঁড়া নেমে আসে। কর্তব্যে গাফিলতির জন্য নয়, রূপান্তরকামী হওয়ার জন্য।

রূপান্তরকামীদের এতটা ভয় পাওয়ার কি সত্যিই কোনও প্রয়োজন আছে? না কি আমাদের মন মনন অন্য রকমকে মেনে নিতে এখনও অপারগ? বা বলা ভাল 'আমার' মতো না-হতে চাওয়াকে নিয়ে এখনও আমাদের অনেক বিড়ম্বনা। না কি এমন মানুষদের খুঁজে বের করতে হয় যাদের বিকৃত, বিচ্যুত, অস্বাভাবিক বানিয়ে নিজেদের 'সুস্থ' 'স্বাভাবিক'-এর দুর্গটাকে আরও আঁটোসাঁটো মজবুত করা যায়, যাতে প্রয়োজনে তাদের প্রান্তে বা বাইরে নিক্ষেপ করা যায়? আজ বোধ হয় প্রশ্নগুলোকে আর এড়িয়ে যাওয়ার অবকাশ নেই।

লেখক পরিচিতি : ডা. অরূপ ঢালী, এমবিবিএস, চিকিৎসক ও প্রাবন্ধিক।
ডা. রঞ্জিতা বিশ্বাস, এমবিবিএস, ডিপিএম, মনোচিকিৎসক, যাদবপুরে মানবীবিদ্যা চর্চা কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত।

If undelivered please return to

Safe International

P-95, Kalindi Housing Estate,
Kolkata - 700089, WB, India,
Ph & Fax - (033) 25223051, 9831908000
Email: safeinternational@gmail.com

ক্লেফট শিশুদের খাওয়ানোর পদ্ধতি এবং সতর্কীকরণ

জীবনের শুরুতে আপনার বাচ্চাকে মায়ের বুকের দুধ খাওয়ালে তা তার ভবিষ্যতের জন্য ভাল স্বাস্থ্যকে নিশ্চিত করবে। পুষ্টির দিক থেকে মায়ের দুধ সর্বোত্তম। মায়ের দুধ শিশুকে রোগব্যধির হাত থেকে রক্ষা করে। প্রথম ছয় মাস মায়ের দুধ শিশুদের জন্য একটা সম্পূর্ণ আহার। এমনকী, এই সময়ে আপনার বাচ্চাকে জল দেওয়ারও প্রয়োজন নেই। ক্লেফট শিশুদের ক্ষেত্রেও মায়ের দুধ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—লিখছেন **অনন্যা মণ্ডল।**

ক্লেফট শিশু বলতে আমরা দু'ধরনের শিশুকে বোঝাচ্ছি। ক্লেফট লিপ----যাদের ওপরের ঠোঁটটা জন্মগতভাবে কাটা থাকে। এবং ক্লেফট প্যালেট, যাদের মুখের ভেতরকার তালুটা জন্মগতভাবে কাটা থাকে। অনেক সময় এ দুটো বিকৃতি এক সঙ্গে থাকে। এ ধরনের শিশুদের বৃদ্ধির জন্য সবচেয়ে জরুরি হল পরিমিত আহার, সঠিক পুষ্টি এবং সঠিক পদ্ধতিতে খাওয়ানো। এই শিশুদের মুখ ও নাকের মাঝে ফাঁক থাকায় হাওয়া বেরিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং এর ফলে শিশু মায়ের বুকের দুধ ঠিকমতো টানতে পারে না। যদি শিশুর শুধুমাত্র ঠোঁটটা কাটা থাকে (Cleft Lip), সেই ক্ষেত্রে মায়ের দুধ টানতে তেমন সমস্যা হয় না এবং সে মাতৃস্তন বা ফিডিং বোতল থেকে ভালভাবেই খেতে পারে। কিন্তু যে সব শিশুদের ঠোঁট এবং তালু উভয়ই কাটা থাকে (Cleft Lip & Cleft Palate), তাদের ক্ষেত্রে খাওয়ানোর বিশেষ পদ্ধতি গ্রহণ করা উচিত।

কম ওজনের বাচ্চাদের ক্ষেত্রে মায়ের দুধ ছাড়াও শিশুদের জন্য তৈরি কৌটোর দুধ, পাস্তুরাইজড গরুর দুধ দেওয়া যেতে পারে। (শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ /পুষ্টি বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অনুযায়ী)।

জন্মের প্রথম এক মাস শিশুকে ওর চাহিদা মতো খাওয়ানো অর্থাৎ শিশু যখনই কেঁদে উঠবে তখনই ওকে খাওয়াতে হবে অথবা দেড়-দুই ঘণ্টা অন্তর শিশুকে ১০-১২ বার খাওয়ানো উচিত।

যেহেতু অনেক সময় ক্লেফট শিশুরা একবারে অনেকটা পরিমাণ খাবার খেতে পারে না, তাই বার বার অল্প অল্প পরিমাণে খাওয়াতে হবে।

দুই-চার মাস বয়সী শিশুদের ৩-৪ ঘণ্টা অন্তর ৬-৮ বার খাওয়াতে হবে।

মায়ের দুধ বের করার জন্য সূচবিহীন সিরিঞ্জ বা ব্রেস্ট পাম্প ব্যবহার করা উচিত।

খাওয়ানোর পদ্ধতি :

- শিশুরা সরাসরি মায়ের দুধ খেতে পারে। দুধ টানতে অসুবিধা হলে মায়ের দুধ বার করে খাওয়ানো যেতে পারে। মায়ের দুধ বের করার জন্য সূচবিহীন সিরিঞ্জ বা ব্রেস্ট পাম্প ব্যবহার করা উচিত। মাতৃদুগ্ধ সুনিশ্চিত করতে মায়ের সুষম আহার এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ জল পান করা প্রয়োজন।
- শিশু মায়ের দুধ টেনে খেতে না পারলে, তাকে স্টিলের ছোট মুখ ওয়ালা এবং লম্বা হাতলসহ চামচ এবং বাটি অথবা সূচবিহীন সিরিঞ্জের সাহায্যে খাওয়ানো যেতে পারে।
- ক্লেফট শিশুদের জন্য বিশেষ ভাবে তৈরি স্কুইড বোতল ব্যবহার করা যায় (The Haberman Feeder or Mead Johnson Cleft Palate Nurser bottle) অথবা যে ফিডিং বোতলগুলো একটু নরম ধরনের হয় অর্থাৎ স্কুইজ করা যায়, সেই বোতলও ব্যবহার করা যেতে পারে। বোতল ব্যবহার করলে সেটা যথাযথভাবে জীবাণুমুক্ত করা কঠিন কিন্তু অত্যাবশ্যক কাজ।

ছয় মাস বয়সের পর থেকে চামচ লাগানো বোতল (স্পুন ফিডার) ব্যবহার করা যেতে পারে।

সতর্কীকরণ :

খাবারের বাটি, চামচ, ফিডিং বোতল ইত্যাদির সঙ্গে বাসনপত্রও ভালভাবে সাবান জল দিয়ে পরিষ্কার করে, দশ থেকে ১৫ মিনিট ধরে জলে ভাল করে ফোটাতে হবে, প্রতি বার ব্যবহার করার আগে।

এর সঙ্গে প্রতি বার শিশুকে খাওয়ানোর আগে এবং পরে নিজের

হাত ভাল করে সাবান দিয়ে ধোওয়া উচিত।

না ফোটানো জল অথবা অপরিষ্কার বাসনপত্র আপনার শিশুকে অসুস্থ করে তুলতে পারে।

ভুল ভাবে আহার মজুত করা, রক্ষণাবেক্ষণ, তৈরি করা আর খাওয়ানো শিশুর স্বাস্থ্যের ওপর খারাপ প্রভাব ফেলতে পারে।

মনে রাখার বিষয় :

- ক্লেফট শিশুকে খাওয়ানোর সময় কোলের ওপর বসিয়ে খাওয়াতে হবে, শুইয়ে কখনওই খাওয়ানো যাবে না। এতে শিশুর শ্বাসনালীতে খাবার গিয়ে শ্বাস আটকে যেতে পারে, যা শিশুটিকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে পারে।
- শিশুকে বসানো অবস্থায় খাওয়ালে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে আহার অনায়াসে খাদ্যনালীতে প্রবেশ করবে, কোনও ভাবেই শিশুর নাক দিয়ে বেরিয়ে আসবে না।
- খেয়াল রাখতে হবে, শিশুর মাথা যেন পেটের থেকে ওপরের দিকে থাকে, কখনওই একই তলে থাকবে না। অর্থাৎ শিশুর মাথা, ঘাড় এবং কাঁধ এক সরলরেখায় থাকবে, এবং চিবুকটা সামান্য ওপরের দিকে হেলানো থাকবে।
- শিশুর স্বাস্থ্যের জন্য আহার অত্যন্ত যত্নসহকারে এবং স্বাস্থ্যসম্মতভাবে তৈরি করা অত্যন্ত জরুরি।
- খাওয়ানোর পর ২০ থেকে ৩০ মিনিট শিশুকে বসিয়ে রাখতে হবে।
- ক্লেফট শিশুদের খেতে তুলনামূলক ভাবে বেশি সময় লাগে, তাই ধৈর্যের সঙ্গে শিশুকে খাওয়াতে হবে।
- মনে রাখতে হবে এই শিশুদের খাবার গিলে খেতে এবং মায়ের বুকের দুধ টানতে অসুবিধা হয়। তাই শিশুকে খাওয়ানোর সময় খাবার গালের এক পাশ দিয়ে মুখের একদম ভিতরে পৌঁছে দিতে হবে চামচ বা স্কুইজ বোতলের নিপলের সাহায্যে।
- শিশুর খাওয়া সম্পূর্ণ হলে এমনকী, খাওয়া চলাকালীন বেশি বার করে এবং বারে বারে ঢেঁকুর তোলাতে হবে, কারণ স্বাভাবিক শিশুদের তুলনায় ক্লেফট শিশুদের খাওয়ার সময় শরীরে বেশি হাওয়া প্রবেশ করে।
- এই ধরনের শিশুদের তালু যেহেতু কাটা থাকে, তাই তাদের খাওয়ানোর সময় বা খাওয়ানোর পর নাক দিয়ে খাবার বেরিয়ে যায়। তবে এটা কোনও ক্ষতিকারক ঘটনা নয়। খেয়াল রাখতে হবে যাতে সঠিক পরিমাণ আহার থেকে শিশু বঞ্চিত না হয়।
- খাওয়ানো হয়ে গেলে পরিষ্কার নরম কাপড় অথবা হাল্কা উষ্ণ গরম জলে ভেজানো কাপড় দিয়ে যত্ন সহকারে নাক এবং তালুর কাটা অংশ ভালভাবে মুছিয়ে দিতে হবে।

স্বাভাবিক শিশুদের তুলনায় ক্লেফট শিশুদের খাওয়ার সময় শরীরে বেশি হাওয়া প্রবেশ করে।

না ফোটানো জল অথবা অপরিষ্কার বাসনপত্র আপনার শিশুকে অসুস্থ করে তুলতে পারে।

অন্য শিশুদের মতো ক্লেফট শিশুদের ছয় মাস বয়সের পর দুধ ছাড়া বাড়িতে তৈরি শক্ত এবং অর্ধ তরল জাতীয় খাবার খাওয়ানো শুরু করতে হবে। যেমন—সুজির পায়েস, গলা ভাত, খিচুড়ি, ডিমের কুসুম সেদ্ধ, যে কোনও ধরনের মরশুমি ফল (ভালভাবে চটকে) অথবা ফলের রস, কম আঁশযুক্ত (less dietary fibre) সব্জি অর্থাৎ আলু, কুমড়ো, পেঁপে ইত্যাদি সেদ্ধ, ডালের জল ইত্যাদি। খাবারের ঘনত্বের মাত্রা এমন করতে হবে যাতে শিশু ঠিক মতো খেতে পারে।

লেখক পরিচিতি : অনন্যা মণ্ডল, এমএসসি, পিজিডিএসএস, ক্লিনিক্যাল নিউট্রিশনিস্ট। বিভিন্ন প্রাইভেট হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত

স্বাস্থ্যের বৃত্তে-র গ্রাহক হোন
সডাক গ্রাহক চাঁদা ৬টি সংখ্যার জন্য ১৮০ টাকা।
Swasthyer Britto-র নামে চেক বা ড্রাফট পাঠান এই ঠিকানায়
এইচ এ ৪৪, সল্টলেক, সেক্টর ৩, কলকাতা ৭০০ ০৯৭
আউটস্টেশন চেকে ৩০ টাকা আরও যোগ করুন
অথবা
NEFT-র মাধ্যমে টাকা পাঠান এই অ্যাকাউন্টে
Swasthyer Britto, A/c No. 0315101025024
Canara Bank, Princep Street Branch
IFSC Code CNRB0000315

এবিপি আনন্দের অ্যাঙ্কর টেলিভিশন সাংবাদিক সন্দীপ্তা চট্টোপাধ্যায় চলে গিয়েছেন ২০১২ সালের ২ ডিসেম্বর, মাত্র ৩৪ বছর বয়সে।

সন্দীপ্তা অন্যের জন্য ভাবতে এবং করতে জানতেন।
তাঁকে মনে রেখে মেয়েদের স্বাস্থ্য নিয়ে সচেতনতা বাড়ানোর এক উদ্যোগ

সন্দীপ্তাকে মনে রেখে

মেয়েদের স্বাস্থ্য–ভুবন

With Best compliments

From

MICRO GRATIA

DERMATOLOGY- OUR OBSESSION

নবজাতকের খাদ্য খাবার

সপ্তম পাঠ

স্তনদানের কিছু সমস্যা

মা শিশুকে স্তন্যদুগ্ধ পান করাতে গেলে নানা রকম সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। মায়ের শারীরিক যে সব সমস্যা হয় বা যে সমস্যাগুলো স্তন্যদান সংক্রান্ত সেগুলো নিয়ে কিছু আলোকপাত করা দরকার – লিখছেন **ডা. স্বপন বিশ্বাস।**

এর আগের লেখায় (*স্বাস্থ্যের বৃত্তে*, আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০১৪) আমরা স্তনদানের প্রথম ছ'টা সাধারণ সমস্যা নিয়ে লিখেছি। এবার শুরু করছি সাত নম্বর সমস্যা থেকে।

৭। স্তন শক্ত ও ভারী হয়ে যাওয়া (Engorged Breast) :

স্তনদান শুরুর প্রথম সপ্তাহের শেষ দিকে অনেক মায়ের স্তন শক্ত ও ভারী হয়ে যায়। ভিতরে দপ দপ করে, ব্যথা হয়, অস্বস্তি হয়। এমনকী, জ্বরও আসতে পারে। সব কিছু মিলে স্বাভাবিক ভাবেই মা ভয় পেয়ে যায়। প্রথম সপ্তাহের শেষে স্তনে অনেক দুধ তৈরি হয় এবং এ কারণে তখন স্তনের রক্ত চলাচলের পরিমাণও অনেক বেড়ে যায়। যার ফলে স্তন এবং আশেপাশের কোষ-কলা ফুলে যায়, শক্ত হয়ে যায়। স্তন এত শক্ত হয় যে শিশু স্তন মুখে নিতে পারে না, তাই ঠিক মতো দুধও পায় না, স্তনের দুধও ফাঁকা হয় না। অবস্থা আরও সঙ্গীন হয়। অনেক সময় শিশুকে যদি অনেকক্ষণ দুধ খাওয়ানো না হয়, তখন দুধ জমে এই অবস্থা তৈরি হতে পারে।

কারণ :

- অনেক দুধ তাড়াতাড়ি জমে যাওয়া।
- দেরিতে দুধ খাওয়ানো শুরু করা।
- শিশুকে ঠিক মতো স্তনে না ধরা।
- স্তনে দুধ সম্পূর্ণ খালি করে না খাওয়ানো।
- অল্প সময় ধরে শিশুকে খাওয়ানো

প্রতিকার :

- স্তনকে বিশ্রাম দেওয়া যাবে না।
- জন্মের পর পরই শিশুকে স্তন পান করাতে হবে।
- অনেক সময় ধরে ধৈর্য ধরে শিশু যতবার চাইবে, যতক্ষণ চাইবে, দুধ খাওয়াতে হবে।
- ঠিক মতো শিশুকে স্তনে ধরতে হবে।
- শিশু দুধ টানতে না পারলে— হাত বা পাম্প দিয়ে দুধ বের করে খাওয়াতে হবে।
- খাওয়ানোর আগে গরম জলে স্তন ধুয়ে নিতে হবে, বা গরম সেঁক দিতে হবে।
- ঘাড়ে এবং পিঠে ম্যাসেজ করতে হবে।
- স্তন হালকা ম্যাসেজ করতে হবে।
- মাকে চিন্তামুক্ত হতে হবে।
- খাওয়ানোর পরে স্তনে ঠান্ডা সেক দিতে হবে।

স্তনের দুধ বের করার একটা সহজ উপায় আছে—

- প্রথমে একটা পাত্রে জল ফোটান
- একটা বড় বোতল নিন
- বোতলে গরম জল ঢালুন
- জল ফেলে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বোতলের মুখ স্তনবৃন্তে চেপে ধরুন
- বোতলের গরম হাওয়া ঠাণ্ডা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বোতলের ভিতরের বায়ু চাপ কমবে, ফলে স্তনের দুধ আপনি এসে বোতলে জমা হবে। বার বার এই পদ্ধতি অবলম্বন করা যাবে।

এর সঙ্গে —

- স্তনকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য অন্তর্বাস ব্যবহার করতে হবে।

- বার বার করে শিশুকে শুধুমাত্র বুকের দুধই খাওয়াতে হবে।
- দরকারে হাত দিয়ে বা পাম্প দিয়ে বুকের দুধ বের করে ফেলে দিতে হবে। গরম জলের মধ্যে বের করলে আরও ভাল হয়। স্তন সহজে নরম হয়।
- প্যারাসিটামল ধরনের হালকা ব্যথার ওষুধ খেলে আরাম হয়।
- দরকারে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। তবে সাধারণত এই অবস্থা ২৪-৪৮ ঘণ্টা থাকে, তারপর কমে যায়।

৮। বুকের থেকে দুধ পড়া (Leaking Breast) :

অনেক স্তন্যদায়িনী মায়ের স্তন থেকে প্রায়ই দুধ পড়তে থাকে। যদিও এটা খুব অস্বস্তিকর, কিন্তু এই ঘটনা প্রায়ই দেখা যায়। অনেক সময় দুধ আপনা থেকেই পড়তে থাকে, আবার অনেক সময় শিশু কাঁদলে বা যখন এক বুকের দুধ খায়, তখন অন্য বুকের দুধ পড়তে পারে। বুকে অধিক পরিমাণে দুধ আসা ও দুধ জমা এর কারণ।

কী করণীয় ?

- বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিশেষ কিছু করার থাকে না। তবে স্তন পান করানোর সময় অন্য স্তনে একটা কাপড় বা প্লাস্টিকের কিছু দিয়ে চাপা রাখলে দুধ সেখানে পড়ে।
- শিশুকে নিয়ে বাইরে বেরোলে অতিরিক্ত ব্রেস্ট প্যাড অন্তর্বাসের মধ্যে রাখা যেতে পারে। যদিও ভিজে গেলে ব্রেস্টপ্যাড পাল্টানো দরকার, না হলে সেখানে ব্যাকটিরিয়া জন্মাতে পারে।
- বুকের দুধ শরীরে লেগে থাকতে পারে, তাই মাকে সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে।

৯। মাস্টাইটিস বা স্তনে-প্রদাহ (Mastitis) :

স্তনের প্রদাহকে মাস্টাইটিস বলে। হঠাৎ আমাদের শরীরে কোথাও জোরে লাগলে সে জায়গা লাল হয়ে যায়, গরম হয়, ব্যথা হয়, ফুলে যায়, এবং সেই অঙ্গের কাজ সাময়িক ভাবে কমে যায়। ডাক্তারি ভাষায় এই অবস্থার নাম Inflammation। এর বাংলা করা হয়েছে প্রদাহ। লাগার ব্যাপারটা একটা উদাহরণ। অন্য অনেক কারণেও ইনফ্ল্যামেশন বা প্রদাহ হতে পারে। সংক্রমণ হলেও হয়।

স্তন্যদায়িনী মায়ের স্তনেও প্রদাহ হতে পারে। স্তনের কোনও কোনও স্থান লাল হয়ে যায়, ব্যথা হয়, গরম হয়, এবং শক্ত হয়ে যায়। বেশি হলে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে, মাথায় যন্ত্রণা হতে পারে এবং মা ক্লান্ত হয়ে পড়েন। অনেকেরই স্তনে প্রদাহ হয়, প্রতি ১০ জন স্তন্যদায়িনী মায়ের মধ্যে ১ জন এই সমস্যায় ভোগেন।

এর প্রধান কারণ দুধ জমে যাওয়া। শিশু যদি সম্পূর্ণ ভাবে দুধ না খায় বা শিশুকে ঠিক সময়ে দুধ খাওয়ানো না হয় তবে স্তনে দুধ জমে যেতে পারে। অন্য যে কোনও কারণে স্তনে দুধ জমে গেলে প্রদাহ হতে পারে। আঘাত লাগলেও হতে পারে। এছাড়া, জীবাণুর সংক্রমণ হলেও প্রদাহ হতে পারে। জীবাণুর সংক্রমণ আবার স্তনবৃন্তে ঘা বা ছড়ে যাওয়া থেকে বা ফেটে যাওয়া থেকে বেশি হয়। কাজেই প্রদাহের অনেক কারণ। যাঁরা প্রথম বার মা হন, তাঁদের ক্ষেত্রে স্তন প্রদাহ বেশি হয়।

কী করণীয় ?

- শিশুকে দুধ খাওয়ানো বন্ধ করা যাবে না।
- বিশ্রাম নিতে হবে।
- প্রয়োজনে ব্যথা কমানোর ওষুধ খেতে হবে।
- গরম সেঁক দিলে উপকার হয়।
- শিশুকে ঠিকমতো ধরতে হবে।
- দরকারে পাম্প দিয়ে বা হাত দিয়ে অতিরিক্ত দুধ স্তন থেকে বের করে দিতে হবে।
- স্তনে হাল্কা ম্যাসেজ করলে দুধ সহজে নামে, উপকার হয়।
- ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

তবে নিশ্চিত হন, এই অবস্থা শিশুর কোনও ক্ষতি করে না। এমনকী, সংক্রমণ যুক্ত স্তনের দুধ খেলেও শিশুর কোনও ক্ষতি হয় না। দুধের সঙ্গে যদি ব্যাকটিরিয়া শিশুর অন্ত্রে প্রবেশও করে, তা পাকস্থলীর অ্যাসিডের দ্বারা ধ্বংস হয়ে যায়।

১০। অতিরিক্ত দুধ জমে যাওয়া (Excess Milk) :

অনেক মায়েরই অতিরিক্ত দুধ তৈরি হয়, যা শিশু খেতে পারে না, ফলে স্তনে দুধ জমে যায়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই দুধ লিক করে ফোয়ারার মতো বাইরে বেরিয়ে আসে। শিশুও ঠিকমতো স্তন মুখে নিতে পারে না, ফলে সে হতাশ হয়ে বুকের দুধ খাওয়া ছেড়ে দিতে চায়। এক দু'সপ্তাহের মধ্যে এ অবস্থা কেটে যায়, কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন বহাল থাকে।

কী করণীয় ?

- দুধ খাওয়ানোর আগে অতিরিক্ত দুধ হাত দিয়ে বা পাম্পের সাহায্যে বের করে দিলে স্তন নরম হবে, শিশু সহজে মুখে ধরতে পারবে।
- শিশু চুষলে দুধ নামে। শিশু যখন স্তনে মুখ দিয়ে জোরে চুষবে এবং দুধ নামা শুরু হবে, তখন শিশুর মুখ সরিয়ে নিয়ে নেমে আসা বেশি দুধ তোয়ালের মধ্যে ফেলে দিতে হবে। তারপর শিশুকে আবার বুকে ধরতে হবে।
- শিশুকে ধরার অবস্থান পাল্টালে উপকার হয়। চিত হয়ে শুয়ে শিশুকে উপুড় করে ধরলে দুধ নেমে এসে শিশুর মুখ ভরিয়ে দেয় না। উপকার হতে পারে।
- বার বার শিশুকে খাইয়ে দেখা যাতে পারে।
- পরপর ৩-৪ বার শিশুকে একটা মাত্র স্তনের দুধ অনেক সময় ধরে খাওয়াতে হবে, যাতে শিশু প্রথম ও শেষ দিকের দুধ পায়। অন্য স্তনের দুধ এই সময় পাম্প করে বের করে ফেলে দিতে হবে। এতে ২৪-৪৮ ঘণ্টার মধ্যে দুধের পরিমাণ কমে।
- এসব সত্ত্বেও শিশু যদি একদমই স্তন মুখে দিতে না চায়, তবে দুধ বের করে বাটি-চামচে খাওয়ানো হতে পারে।

১১। স্তনবৃন্তে যন্ত্রণা (Sore nipple) :

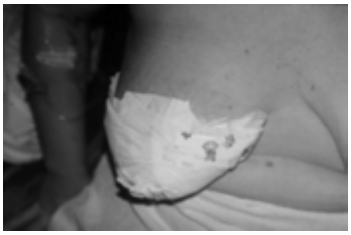

স্তনবৃন্তে বা নিপলে ব্যথা বা যন্ত্রণা প্রথম বারের মায়েদের এতই বেশি হতে পারে যে অনেক মা-ই মনে করেন এটা স্বাভাবিক ঘটনা। তারা ভাবেন, দুধ খাওয়ালে এই যন্ত্রণা হবেই। প্রথম দিকে নতুন মায়েদের ক্ষেত্রে দু' চার দিন ব্যথা হতে পারে, কিন্তু তারপরেও ব্যথা থাকা মোটেই স্বাভাবিক নয়। যদি শিশুকে ধরার টেকনিক বা পদ্ধতি ঠিক না হয়, যদি শিশু স্তনকে ঠিক মতো মুখে পুরতে না পারে, তবে স্তনবৃন্তে ব্যথা হওয়াটাই স্বাভাবিক।

অন্য যে কারণে এটা হতে পারে :

- শিশু যদি স্তনবৃন্ত জোরে টেনে মুখে নেয় বা চোষে, তবে ব্যথা হতে পারে।
- শিশুর জিহ্বার নীচের অংশ অনেক সময় মুখের সঙ্গে আটকে বা জোড়া লেগে থাকে, তাই জিহ্বা ঠিক মতো বাইরে বের হতে পারে না। একে বলে Tongue-tie। এরকম হলে শিশু ঠিক মতো স্তনবৃন্ত চুষতে পারবে না, মাড়ি দিয়ে কামড়ায়। ফলে ব্যথা হয়।
- শিশুর মুখের থ্রাস যদি স্তনবৃন্তে সংক্রমণ ঘটায়, তবে স্তনবৃন্তে ব্যথা হবে।
- স্তনবৃন্তের চর্মরোগ বা ডার্মাটাইটিস ব্যথার কারণ হতে পারে।
- একটু বড়ো শিশু অনেক সময় স্তনবৃন্ত কামড়ে ব্যথা করে দিতে পারে।
- গর্ভ অবস্থায় স্তনবৃন্ত নরম থাকে। তখন যদি অন্য শিশুকে স্তনপান করানো হয়, তবে স্তনবৃন্তে ব্যথা হতে পারে।
- অনেক ক্ষেত্রে অন্তর্বাস ব্যথার কারণ হয়।

কী করণীয়?

- দুধ খাওয়ানোর সময় শিশুর মুখের দিকে নজর রাখতে হবে, ঠিক মতো স্তন মুখে নিতে পারছে কি না দেখতে হবে। প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে।
- জিহ্বা জোড়া থাকলে ডাক্তার দেখিয়ে অপারেশন করে ঠিক করে নিতে হবে।
- থ্রাস হলে চিকিৎসকের পরামর্শে চিকিৎসা করাতে হবে।
- অন্তর্বাস দরকারে পাল্টাতে হবে।
- দুধ খাওয়ানোর আগে স্তন গরম জলে ধুয়ে পরিষ্কার করতে হবে।
- স্তনবৃন্তে ল্যানোলিন জাতীয় মলম লাগালে উপকার হয়।

মনে রাখতে হবে, শিশুর ঠিকমতো স্তন মুখে নিতে না পারাটাই ব্যথা বা যন্ত্রণার প্রধান কারণ। তাই এ রকম হলে মনে করে নিতে হবে শিশু ঠিকমতো দুধ পাচ্ছে না। তার পুষ্টির অভাব ঘটাটাই স্বাভাবিক। তাই শিশুর পুষ্টির ওপর নজর দিতে হবে। কিন্তু ব্যথা হলেও শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানোর বাধা নেই।

১২। স্তনবৃন্ত ধাঁধা (Nipple confusion) :

স্তনবৃন্ত ধাঁধা কি তাই নিয়ে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। (স্বাস্থ্যের বৃত্তের ডিসেম্বর ২০১৩ - জানুয়ারি ২০১৪ সংখ্যা)। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আর একটু আলোচনা দরকার, কারণ এর ফলে শিশু স্তন ত্যাগ করতে পারে, স্তনবৃন্তে ব্যথা হতে পারে, দুধ জমে যেতে পারে বা স্তনের প্রদাহ হতে পারে।

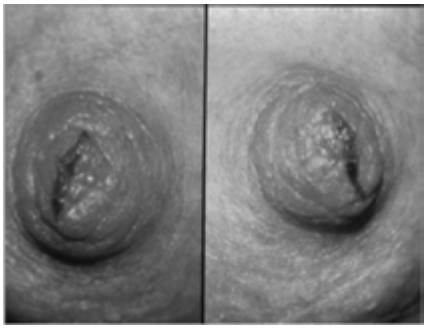

যদিও আগে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে, তবু নতুন পাঠকদের জন্য সংক্ষেপে বলি, শিশুকে যদি আগে বোতলের দুধ ধরানো হয়, তখন সে একভাবে দুধ খেতে শেখে, কিন্তু তারপরে যখন স্তনে দেওয়া হয়, তখন সে ঠিকমতো দুধ বের করে খেতে পারে না, কারণ স্তন থেকে দুধ বের করার কায়দা আলাদা। তখন শিশু ধাঁধায় পড়ে। সে বুঝতে পারে না কী ভাবে দুধ বের করে খাবে। একেই বলে স্তনবৃন্ত ধাঁধা (Nipple confusion)।

কী করণীয়?

- একেবারে শুরু থেকেই বোতলে না খাওয়ানো, যতক্ষণ না স্তনে ঠিক মতো দুধ আসে।
- যদি দুধ বের করে খাওয়াতে হয়, তবে বাটি চামচে খাওয়ানো উচিত।
- শিশুকে ঘুমের মধ্যে দুধ খেতে দিলে অনেক সময় শিশু এই ধাঁধা কাটিয়ে ওঠে।
- শিশুর মুখ ভাল করে পরীক্ষা করে দেখতে হবে কোনও থ্রাস বা ঘা আছে কি না, যার জন্যে সে সহজে বোতলের দুধ খেতে চায়।
- শিশু সত্যিই তার পরেও যদি স্তন মুখে নিতে না চায়, তবে স্তনের দুধ বের করে খাইয়ে তার পুষ্টি ঠিক রাখা উচিত।
- এই অবস্থায় শিশুকে সব সময়ই প্রথমে বুকের দুধ খাওয়ানোর চেষ্টা করতে হবে। শিশু যদি না খেতে চায়, তবে বুকের দুধ বের করে খাইয়ে আবার বুকেই ধরতে হবে। ধীরে ধীরে ধৈর্য ধরলে শিশু এই স্তনবৃন্দ ধাঁধা (Nipple confusion) কাটিয়ে উঠবে।

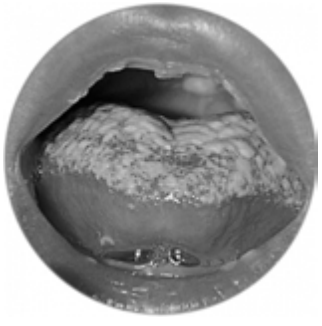

১৩। স্তনবৃন্ত কামড়ানো (Nipple Bite) :

শিশুর দাঁত ওঠে ৬ মাস বয়সের পরে। কিন্তু ১ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর প্রধান পুষ্টি আসে বুকের দুধ থেকে। দাঁত ওঠার পরে বা ওই সময়ে শিশুর মাড়ি শক্ত হয়ে যায়। সে সব কিছু কামড়াতে চায়। তবে শিশুর প্রথম দাঁত

ওঠে নীচের মাড়ির মধ্যের দু'টো দাত। সেই দাঁত দিয়ে শিশু কামড়াতে পারে না, কারণ দুধ খাওয়ার সময় তার জিহ্বা সেই দাঁতকে ঢেকে রাখে। আরও দাঁত উঠলে সে কামড়াতে পারে। শিশু যখন তার ধারালো দাঁত দিয়ে প্রথম স্তনে কামড় মারে, তখন মা হঠাৎই চিৎকার করে ওঠে। এর ফলে

- শিশুও আতঙ্কিত হয়ে আর কখনও স্তন না কামড়াতে পারে,
- স্তনে মুখ দিতে না চাইতে পারে,
- অথবা মজা পেয়ে বার বার কামড়াতে পারে।

কোনও কোনও ক্ষেত্রে খাওয়ার শেষ দিকে যখন শিশুর ঘুমের ঘোর আসে, তখন কামড়ায়। কোনও কোনও শিশু অনেকক্ষণ স্তনবৃন্ত মুখে নিয়ে থাকতে চায়, সরাতে গেলে কামড় মারে। কেউ বেশি ক্ষুধার্ত হলে কামড়ায়, কেউ আবার বন্ধ নাকের জন্যে বিরক্ত হয়ে কামড়াতে পারে। অনেক মা-ই অভ্যস্ত হয়ে যান, বুঝতে পারেন শিশু কখন কামড়াতে যাচ্ছে। এমন হলেও শিশুকে স্তন থেকে সরিয়ে নিতে নেই, বরং কামড়াতে চাওয়ার সময় মা যদি তার একটা আঙুল পাশ দিয়ে শিশুর মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে পারেন, তবে শিশু আর স্তন কামড়াবে না। আঙুল কামড়াবে। এতে দুধ খাওয়ানো ঠিক মতো চলবে। যতক্ষণ না খুব অসুবিধা হচ্ছে, ততক্ষণ দুধ খাইয়ে যাওয়া উচিত।

কী করণীয়?

- এই সময় শিশু মায়ের কথা বুঝতে পারে। কামড়ালে শিশুকে চোখে চোখ রেখে 'না' বলতে হবে। প্রয়োজনে তখন সাময়িক ভাবে স্তন সরিয়ে নিয়ে ভয় দেখাতে হবে যে এমন করলে আর তুমি বুকের দুধ পাবে না।
- শিশুর দিকে বেশি মনোযোগ দিয়ে শিশুর সঙ্গে বন্ধন দৃঢ় করতে হবে। দুধ খাওয়া শেষ হলেই শিশুকে সরাতে হবে।
- ঘুমিয়ে পড়লে শিশুকে সরিয়ে দিতে হবে।
- শিশুকে কামড়ানোর জন্য খেলনা দিতে হবে।
- খাওয়ানোর আগে মুখে পরিষ্কার আঙুল বা খেলনা দিলে কাজ হয়।

১৪। ছোট স্তনবৃন্ত বা ঢুকে থাকা স্তনবৃন্ত (Inverted or flat nipple):

অনেক মায়ের স্তনবৃন্ত স্তনের চেয়ে উঁচু না হয়ে কিছুটা ভিতরে ঢুকে থাকে। স্বাভাবিক ভাবেই তার সন্তান স্তন মুখে নিয়ে টানতে পারবে না এবং দুধ ও তার মুখে আসবে না। মায়ের দুশ্চিন্তা বাড়ে। শিশুর জন্মের পরপরই এই ত্রুটি ঠিক করার চেষ্টা করতে হবে।

কী করণীয়?

- প্রথমে মাকে নিশ্চিত করতে হবে যে এটা নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। মা বেশি চিন্তা করলে সেই দুশ্চিন্তার জন্যেই দুধ কম হবে।
- মাকে বোঝাতে হবে, শিশু স্তনবৃন্ত চুষে দুধ বের করে না সে অ্যালভিওলার চারপাশে চাপ দেয়, দুধ স্তনবৃন্ত দিয়ে তার মুখে যায়। (স্বাস্থ্যের বৃত্তে ডিসেম্বর, ২০১৩ -জানুয়ারি, ২০১৪ সংখ্যা)।
- শিশুকে যে ভাবে ধরলে স্তনবৃন্ত বেশি বেরিয়ে থাকে, সে ভাবে শিশুকে ধরতে হবে।
- সিরিঞ্জ এর মাধ্যমে স্তনবৃন্তকে বাইরে বের করে আনা যায়।

পদ্ধতি :

- একটা ইঞ্জেকশনের প্লাস্টিকের সিরিঞ্জ নিয়ে পিস্টন খুলে ফেলতে হবে।
- এবার সিরিঞ্জের ব্যারেলের সরু দিকটা ভাল করে ধারালো ছুরি দিয়ে সমান করে কাটতে হবে।
- পিস্টনটি সেই কাটা দিক দিয়ে উল্টো করে ঢোকাতে হবে।
- এবার সিরিঞ্জের প্লেন দিকটা স্তনের কাছে নিয়ে স্তনবৃন্ত তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হবে।
- পিস্টন এবার বাইরের দিকে টানতে হবে।
- ৩০ সেকেন্ড থেকে ১ মিনিট এভাবে হাল্কা করে টেনে ধরে থাকতে হবে।
- সারাদিনে বার বার এভাবে চেষ্টা করতে হবে।
- মা ব্যথা অনুভব করলে টান কমাতে হবে।
- শিশুকে বুকে ধরানোর আগে এভাবে স্তনবৃন্ত বের করে শিশুর মুখে দিলে সে নিজেই টানবে।
- প্রথম দিকে বুকের দুধ বের করে চামচ-বাটি দিয়ে খাওয়ানো যেতে পারে।

বিশেষ বিশেষ শিশুর ক্ষেত্রে যে সব সমস্যা দেখা দিতে পারে :

১। শিশুর গঠনগত ত্রুটি — জোড়া না লাগা ঠোঁট ও তালু (Cleft lip & Palate) :

অনেক শিশু কিছু গঠনগত ত্রুটি নিয়ে জন্মায়। এর মধ্যে যেটা দুধ খেতে সমস্যা তৈরি করে তা হল, ঠোঁট ঠিকমতো তৈরি না হওয়া (Cleft lip)। আরও কিছু শিশুর তার সঙ্গে ওপরের মাড়ি ও তালুও তৈরি হয় না (Cleft palate)।

এ রকম হলে শিশু দুধ টানতে বা চুষতে পারে না। চুষতে পারলেও বেশি বাতাস ঢুকে যায়, শিশুর নাক দিয়ে বেরিয়ে যায়, শিশু ক্লান্ত হয়ে যায়। ঠিক মতো দুধ পায় না এবং ওজনও বাড়ে না।

এ অবস্থায়ও বুকের দুধ খাওয়ানোর চেষ্টা করতে হবে। ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে শিশুর অবস্থা অনুযায়ী যা করণীয়, তা করতে হবে। ঠিক মতো ধরাটা এখানে গুরুত্বপূর্ণ।

২। নির্দিষ্ট সময়ের আগে জন্মানো শিশু (Preterm baby) :

যদি শিশু আগে জন্মায়, তার গঠন সম্পূর্ণ হয় না। সে দুধ টেনে খেতে সক্ষম নাও হতে পারে।

এমন হলে প্রথমে শিশুকে বুকের দুধ বের করে খেতে দিতে হবে। শিশু একটু একটু করে দুধ খাওয়া শুরু করবে। তবে শিশুর ওজন যদি খুবই কম হয়, বা শিশু খুব দুর্বল থাকে তখন তাকে প্রয়োজনে নাকে নল পরিয়ে খাবার দিতে হতে পারে বা স্যালাইন দিতে হতে পারে। সব কিছুই নির্ভর করছে শিশু কতটা সক্ষম তার ওপর। এ বিষয়টা সব সময় বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের ওপর ছেড়ে দেওয়া উচিত এবং তার পরামর্শে চলা উচিত।

৩। ডাউন সিনড্রোম (Down Syndrome) :

ডাউন সিনড্রোম নামে একটা রোগ আছে, বেশি বয়সী মায়েদের শিশুদের মধ্যে এটা বেশি হয়। কোষের ক্রোমোজোম সংক্রান্ত ত্রুটির জন্যে এটা হয়। জন্ম থেকেই শিশুর পেশির জোর কম থাকে, এছাড়া মুখে ও হৃদযন্ত্রে নানা রকম ত্রুটিও থাকতে পারে। পেশির জোর কম থাকার জন্য শিশুরা ঠিকমতো বুকের দুধ টেনে নাও খেতে পারে। প্রথম দিকে অসুবিধা হলেও পরে এই শিশুরাও ঠিক মতো বুকের দুধ টেনে খেতে পারে, কিন্তু খাওয়ানোর সময় শিশুর ওপর বেশি নজর রাখতে হবে, সতর্ক থাকতে হবে, দেখতে হবে যাতে দুধ ঠিক মতো গিলতে পারে। দরকারে ডাক্তারের সাহায্য নিতে হবে।

দুধ খাওয়ানোটা কোনও কোনও মায়ের ক্ষেত্রে কোনও সমস্যাই তৈরি

করে না। আবার অনেক মায়ের ক্ষেত্রে অনেক কিছুই হতে পারে। শরীর ও রোগ এমন একটা বিষয়, যাকে কোনও নির্দিষ্ট ঘটনা দিয়ে সীমাবদ্ধ করা যায় না। তাই বেশি ঘটা ঘটনাগুলো নিয়ে আলোচনা করা হল, এর বাইরেও অনেক সমস্যা দেখা দিতে পারে। তেমন কিছু হলে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে চলতে হবে। তবে একটা জিনিস পরিষ্কার, বেশির ভাগ সমস্যার মূলে আছে মায়ের-শিশুর সম্পর্ক এবং মায়ের পক্ষ থেকে শিশুর দিকে নজর কম দেওয়া। শুধু নজর দিয়ে দেখলে হবে না, শিশুর দুধ খাওয়ার প্রতিটা ধাপেই মাকে সতর্ক থাকতে হবে। শুরু থেকেই যদি শিশুকে ঠিক মতো বুকে ধরা যায়, বোতল বা অন্য খাবার না দেওয়া হয়, শিশু যদি ঠিকমতো স্তন মুখের মধ্যে নিতে পারে, টানতে পারে, মা যদি নিশ্চিন্ত থাকেন, মা-শিশুর সম্পর্ক যদি ভাল থাকে, তবে স্তনেও ঠিকমতো দুধ আসবে, শিশুর পেট ভরবে, পুষ্টি হবে এবং সমস্যাও কম হবে।

খাওয়া সংক্রান্ত যে সব প্রশ্ন মায়ের মনে আসতে পারে :

১। শিশুকে খাওয়ানোর জন্য ঘুম থেকে তোলা উচিত?

অনেক শিশুই প্রথম কয়েক দিন বেশি ঘুমোয়। দীর্ঘ সময় ধরে লেবারে থাকা, মায়ের ওপর প্রয়োগ করা বিভিন্ন ওষুধের প্রতিক্রিয়ায় এমন হতে পারে। শিশু ঘুমিয়ে থাকলেও অবশ্যই তাই ২/৩ ঘণ্টা পরে পরে জাগিয়ে খাওয়াতে হবে। শিশুর খিদে পেলে এমনিতেই তাদের পেটে ব্যথা হয়, তারা জেগে যায়, কিন্তু কোনও কোনও শিশু জাগে না, তাদের জাগিয়ে না খাওয়ালে পুষ্টি হয় না, ওজন কমে, ডিহাইড্রেশান হয়। বেশি গরমেও ঘুম বেশি হয়।

শিশুকে জাগানোর জন্যে স্পঞ্জ বাথ দেওয়া যেতে পারে। (কাপড় জলে ভিজিয়ে গা হাত পা মুছিয়ে দেওয়া)। শিশুর পোষাক খুলে তাকে গায়ের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে তার সঙ্গে কথা বলে, তাকে নাড়িয়ে অথবা পায়ের পাতায় হাত দিয়ে সুড়সুড়ি দিলেও শিশু জেগে যায়। যে ভাবেই হোক, ২৪ ঘণ্টায় শিশুকে কমপক্ষে ১০ বার খাওয়াতে হবে। রাতে যদি শিশু ও মা বেশিক্ষণ ঘুমিয়ে থাকে তবে দিনের বেলা বার বার খাইয়ে তার চাহিদা পূরণ করতে হবে।

২। কী করে বোঝা যাবে যে শিশু যথেষ্ট দুধ পাচ্ছে?

এ বিষয়ে আগেই আলোচনা করা হয়েছে।

৩। শিশু যদি সারা রাত জেগে থাকে?

বেশির ভাগ শিশুই রাতে জাগে, দিনে বেশি ঘুমোয়। অনেক মা মনে করেন, তার শিশু খিদের জন্য জেগে আছে। তিনি বাইরের দুধ বেশি করে খাইয়ে শিশুর পেট ভরাতে চান। কিন্তু ঘটনা আদৌ তা নয়। গর্ভাবস্থায় মা সারাদিন চলাফেরা কাজকর্ম করেন, সেই আরামে শিশু ঘুমায়, রাতে মা যখন শুয়ে পড়েন তখন শিশু জাগে এবং খেলা করে, মায়ের পেটে লাথি মারে। মা বোঝে শিশু নড়ছে। কাজেই মা এবং শিশুর ঘুম-জাগরণের অভ্যাস বিপরীত। জন্মের ৩/৪ মাস পর্যন্ত এভাবে চলতে পারে। তাই খাওয়ার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই।

৪। শিশু যদি পাতলা পায়খানা করে?

স্বাভাবিক স্তনপান করা শিশুর মল হয় পাতলা, হলুদ। তার মধ্যে দইয়ের মতো দানা দানা থাকে, অনেকটা যেন ডিমের কুসুমের মতো। যতবারই শিশু দুধ পান করে, ততবার পাতলা মল ত্যাগ করে। মায়েরা একে ডায়রিয়া বলে ভুল করতে পারেন। কিন্তু বুকের দুধ খেলে শিশুর ডায়রিয়া কম হয়। ডায়রিয়ার মল হয় সবুজ, দুর্গন্ধ যুক্ত, প্রচুর আম বা মিউকাস থাকে তার মধ্যে। অনেক সময় মা যদি পায়খানা নরম করার ওষুধ খান তবে শিশুর পাতলা পায়খানা হতে পারে। এই জন্য মায়ের এই ধরনের ওষুধ খাওয়া ঠিক নয়।

৫। শিশু কি রাত্রে মায়ের পাশে থেকে মায়ের দুধ খাবে?

আমরা আগে বার বার বলেছি, 'মায়ে ছায়ে গায়ে গায়ে' থাকবে। কিন্তু শিশুর 'হঠাৎ মৃত্যু' (Sudden infant death syndrome—SIDS) কমাতে আমেরিকান অ্যাকাডেমি অফ পেডিয়াট্রিক্সের সুপারিশ 'শিশু আর মা এক বিছানায় ঘুমাবে না। শিশুকে খাওয়ানোর জন্য রাতে মায়ের কাছে নিয়ে আসা হবে, শিশু থাকবে মায়ের কাছেই কিন্তু আলাদা বিছানায়। খাওয়া হয়ে গেলে মা ঘুমোতে যাবার সময় যে যার যার নিজের বিছানায় যাবে।'

৬। শিশুর যদি কোলিক (Colic) বা পেটে ব্যথা হয় বা কাঁদতে থাকে?

শিশুর কান্না একটা স্বাভাবিক ঘটনা। সাধারণত এই কান্নার সময় বিকাল ৪টে থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত হয়। এই সময় বাড়ির অন্যান্য সবাই যার যার কাজে ব্যস্ত থাকে, ফলে শিশুর দিকে নজর কম পড়ে। শিশু একা একা থাকে এবং তার কান্নাও বাড়ে। শিশুর দিকে নজর দিলে, চোখের সামনে খেলনা ঘোরালে, গান বাজালে শিশু শান্ত হয়। এই কান্না কোলিক নয়।

কিন্তু যে কান্না থামে না, পেটের অস্বস্তির কারণে হয় তাকে কোলিক বলে। তিনের সূত্র ধরে একটা আন্দাজ পাওয়া যায়, কান্না কোলিক কি না। কোলিকের কান্না—

- ১। দিনে ৩ ঘণ্টার বেশি হয়।
- ২। সপ্তাহে ৩ দিনের বেশি হয়।
- ৩। ৩ সপ্তাহের বেশি চলতে থাকে।

কোলিকের কারণ অসম্পূর্ণ পরিপাক তন্ত্র বা স্নায়ু তন্ত্র এবং নানা ধরনের খাবারের অ্যালার্জি, শিশুর বেশি দুধ খেয়ে নেওয়া। কোলিকের কারণে বেশি কাঁদলে ডাক্তার দেখিয়ে ব্যবস্থা করতে হবে।

৭। শিশুর কোষ্ঠকাঠিন্য হলে কি করণীয়?

বুকের দুধ খাওয়া শিশুদের কোষ্ঠকাঠিন্য বা কনস্টিপেশন (Constipation) খুব কম হয়। কোনও কোনও শিশু ৩/৪ দিন পরেও মলত্যাগ করে। তবে সাধারণত ৬ সপ্তাহ বয়সের পরে পরিপাকতন্ত্র পরিণত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সঠিক মলত্যাগের অভ্যাস গড়ে ওঠে। বাইরের খাবার খাওয়া শিশুদের এই সমস্যা বেশি হয়। অনেক সময় দুধ গাঢ় করে গোলাই এর কারণ হতে পারে। তাই দুধে জলের পরিমাণ বেশি দিয়ে বা চিনি মিশিয়ে খাওয়ালে অনেক ক্ষেত্রে উপকার পাওয়া যায়। কিন্তু যদি দীর্ঘদিন এই সমস্যা থাকে তবে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। কারণ মলদ্বারের বা অন্ত্রের গঠনগত ত্রুটিও এর কারণ হতে পারে।

দুধ খাওয়ানোর সমস্যা নিয়ে এই আলোচনা আপাতত শেষ। আবার বলি, এই আলোচনার বাইরেও অনেক সমস্যা দেখা দিতে পারে। সে ক্ষেত্রে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়াই শ্রেয়।

লেখক পরিচিতি : ডা. স্বপন বিশ্বাস, ডিসিএইচ, এমডি, শিশু বিশেষজ্ঞ। একটা সরকারি হাসপাতালে কর্মরত।

এক্ল্যাম্পসিয়া আটকাতে ম্যাগসালফ

সামান্য একটা ইঞ্জেকশন। বহু পুরনো তার ব্যবহারের পদ্ধতি। মা ও শিশুর মৃত্যুহার কমাতে ওই পদ্ধতিই যে বহু ক্ষেত্রে বড় হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে তা চিকিৎসকমহল মেনেও নিয়েছে বার বার। কিন্তু তার পরেও রাজ্যের বহু সরকারি হাসপাতালে ওই সামান্য জিনিসটিই মজুত থাকে না। বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের কাছে মানুষের জীবন যে কত তুচ্ছ হয়ে উঠতে পারে, রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর এই ছবি হয়তো তারই প্রমাণ—লিখছেন **সোমা মুখোপাধ্যায়।**

বহু বছর ধরেই মা ও শিশুর মৃত্যু হার কমাতে ম্যাগসালফ ইঞ্জেকশনের ওপরে জোর দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু জেলা হাসপাতালগুলো এমনকী কলকাতার বহু তথাকথিত বড় হাসপাতালেও এই ইঞ্জেকশন নিয়মিত সরবরাহ হয় না। ঘটা করে জেলায় জেলায় যখন 'ইমার্জেন্সি অবস্টেট্রিক কেয়ার প্রোগ্রাম' চলে, তখন ম্যাগসালফ ইঞ্জেকশনের প্রয়োজনীয়তা কথা ফলাও করে বলা হয়। কিন্তু বিভিন্ন হাসপাতালের ডাক্তার-নার্সদের সঙ্গে কথা বললে জানা যায়, ওই ইঞ্জেকশন তাঁরা চোখেই দেখেননি। ইমার্জেন্সি অবস্টেট্রিক কেয়ার প্রোগ্রামে ওই 'কেয়ার'-এর গোড়ার কথাটাই অধরা থেকে যায় বার বার। একে তো গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কাজ করার ন্যূনতম অভিজ্ঞতা ছাড়াই বহু ডাক্তার জেলায় জেলায় এই প্রশিক্ষণ দিয়ে চলেছেন। যেখানে বহু সময়ে বিদ্যুৎ সংযোগ চলে যায়, সাকুল্যে একজন ডাক্তার আর নার্স, কখনও কখনও তাও জোটে না, ওষুধপত্র মজুত থাকে না বললেই চলে, সেখানে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের গল্প শুনিয়ে চলে যান তাঁরা। অথচ ন্যূনতম প্রয়োজনের জিনিসটুকুও না মেলায় প্রসূতিদের ঝুঁকি কমে না কোনও ভাবেই।

প্রতি বছর রাজ্যে যত সংখ্যক প্রসূতির মৃত্যু হয়, তার মধ্যে ২৫ শতাংশ ক্ষেত্রে কারণ হিসেবে থাকে এক্ল্যামপশিয়া বা গর্ভকালীন খিঁচুনি রোগ। এই ম্যাগনেশিয়াম সালফেট ইঞ্জেকশন ব্যবহার করে সেই হার এক শতাংশে নামিয়ে আনা সম্ভব। আমেরিকার পার্ক ল্যান্ড মেডিক্যাল সেন্টারে ১৯৭৫ সালে প্রথম প্রসূতিদের ওপরে এই ম্যাগনেশিয়াম সালফেটের প্রয়োগ শুরু করে সুফল পাওয়া গিয়েছিল। ভারতে বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজে ১৯৮৫ সাল থেকে এই পদ্ধতি চালু হয়েছে। কলকাতার এক মেডিক্যাল কলেজের স্ত্রী রোগ বিভাগের এক চিকিৎসক জানিয়েছেন, সাধারণত স্নাতকোত্তর স্তরে চিকিৎসকেরা এই পদ্ধতির প্রয়োগ সম্পর্কে জানতে পারেন। কিন্তু গ্রামে যে চিকিৎসকেরা কাজ করেন, তাঁদের অধিকাংশেরই সেই ডিগ্রি নেই। তা হলে তাঁরা কী করবেন?

একটা অত্যন্ত সহজ এবং কম খরচের পদ্ধতির প্রয়োগ করতে না পারায় সন্তানের জন্ম দেওয়ার সময়ে মহিলাদের মৃত্যু কি ঘটতেই থাকবে? তাই ঠিক হল, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা গ্রামের ডাক্তারদের এই পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেবেন। কিন্তু আরও বহু সদর্থক ভাবনার মতো এটাও ফাইলবন্দি হয়ে থেকে গিয়েছে অচিরেই।

প্রসবের আগে বা পরে মহিলাদের এক্ল্যাম্পসিয়া হতে পারে। যাঁদের হাইপারটেনশন রয়েছে, পা ফোলার প্রবণতা রয়েছে, রক্তচাপও যথেষ্ট বেশি, তাঁদের ক্ষেত্রে এই রোগের আশঙ্কা খুবই বেশি। বিপদের কথা হল, প্রসবের আগে যদি মা এক্ল্যাম্পসিয়ায় আক্রান্ত হন, তা হলে গর্ভস্থ সন্তানেরও বড়সড় ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। ম্যাগনেশিয়াম সালফেট ব্যবহার করলে এই ঝুঁকি এক ধাক্কায় অনেকটাই কমানো সম্ভব।

ম্যাগনেশিয়াম সালফেট ইঞ্জেকশন ব্যবহার করে প্রসূতি ও সদ্যোজাত শিশুর মৃত্যুর হার কমিয়ে আনার এই চেষ্টা বহু বছর আগেই শুরু হয়েছে গোটা দেশে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য দফতর এবং ফেডারেশন অব গাইনিকলজিকাল সোসাইটিজ অব ইন্ডিয়া অর্থাৎ ফগসি যৌথভাবে সারা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের চিকিৎসকদের মধ্যে এই পদ্ধতি ছড়িয়ে দেওয়ার কাজ শুরু করেছিল। এই প্রকল্পের পোশাকি নাম দেওয়া হয় 'ইমার্জেন্সি অবস্টেট্রিক কেয়ার প্রোগ্রাম'। পূর্বাঞ্চলে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজকে এই প্রশিক্ষণের কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। ভোপাল, বারাণসী এবং গুয়াহাটিতেও এমন কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের সমীক্ষা অনুযায়ী, সমস্ত কেন্দ্রের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা পশ্চিমবঙ্গে। কী হয়েছে এ রাজ্যে? বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা প্রত্যন্ত গ্রামের চিকিৎসকদের এই বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে প্রশিক্ষণ চলেছে। বহু চিকিৎসক প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। কাজকর্মের সরকারি রেকর্ডের খাতা ভরে উঠেছে দ্রুত। কিন্তু ম্যাগসালফ ইঞ্জেকশনের সরবরাহ নিয়মিত হয়নি কোনও ভাবেই।

কেন ম্যাগসালফ ইঞ্জেকশনের সরবরাহ অনিয়মিত? এর দাম কি খুব বেশি? এই ইঞ্জেকশন জোগাড় করতে কি খুব কাঠখড় পোড়াতে হয়? খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছে, এর কোনওটাই নয়। তা হলে? উত্তর একটাই। স্রেফ সদিচ্ছার অভাব। এই ইঞ্জেকশনের প্রয়োজনীয় ওষুধের তালিকা তৈরি করার দায়িত্ব যাঁদের উপরে, সরবরাহ নিশ্চিত করাটা যাঁদের পেশাগত দায়িত্ব, তাঁদের অনেকেই এ নিয়ে অন্ধকারে।

সংখ্যাতত্ত্বের আলোচনা টেনে এনে রাজ্যের স্বাস্থ্যকর্তারা বোঝাতে চান, প্রসূতি ও শিশু মৃত্যু অনেকটাই কমেছে। দাবির পুরোটা হয়তো মিথ্যাও নয়। কিন্তু ঘটনা হল, ম্যাগনেশিয়াম সালফেটের মতো সামান্য হাতিয়ার যদি মজুত থাকত, তা হলে আরও বহু মহিলার জীবনহানি রুখে দেওয়া সম্ভব হত। শহর বা জেলা নয়, প্রত্যন্ত গ্রামেও ওই পরিষেবা পৌঁছে দিয়ে স্বাস্থকর্তারা যদি সামান্য দায়িত্ববোধের পরিচয় দিতেন, তা হলে বেঘোরে মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যেতেন অনেকে। শুধু ডাক্তার নয়, নার্স এবং সাধারণ স্বাস্থ্যকর্মীদেরও এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার কথা ভাবা হয়েছিল। কিন্তু আদতে তার প্রায় কিছুই হয়নি।

যত ঢাকঢোল পিটিয়ে এই ইঞ্জেকশন ব্যবহারের কথা ভাবা হয়েছিল, তার সিকিভাগও তা বাস্তবায়িত করার জন্য ভাবা হয়নি। ফলে সামান্য খরচে যে পরিষেবা দেওয়া যেত, তা বহু ক্ষেত্রেই অধরা থেকে গিয়েছে।

লেখক পরিচিতি : সোমা মুখোপাধ্যায়, প্রাবন্ধিক।

ওভারি— সিস্ট ও টিউমার

'মেয়েদের অসুখ' মানেই যেন গোপন কিছু। তার ওপর যদি যৌনাঙ্গের অসুখ হয়, তো রোগী থেকে ডাক্তার, সবাই কথা বলেন ফিসফিসিয়ে। অথচ রোগের তো আর সামাজিকতা বোধ নেই, তাই মেয়েদের ডিম্বাশয় তথা ওভারিতে সিস্ট আর টিউমার আকছার হচ্ছে। সেগুলো নিয়ে কী করবেন সহজ কথায় বুঝিয়ে বলছেন

ডা. সঞ্জীব মুখোপাধ্যায়।

আজকাল মেয়েদের অসুখের লিস্টের মধ্যে 'ওভারিয়ান সিস্ট' একটা নিয়মিত জায়গা করে নিয়েছে। বিশেষত কমবয়সী—১৬ থেকে ২৮ বছর বয়সী অনেককেই দেখা যায়— তার আসল কষ্ট অর্থাৎ তার কী হয়েছে জিজ্ঞেস করলেই সে বলে, আমার ওভারিতে 'সিস্ট' হয়েছে। অর্থাৎ বোঝা যায় অসুখটাকে খুব কৃতিত্বের সঙ্গে তলপেট থেকে 'মাথার' মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া গিয়েছে। এবার এই নিয়েই দিন গুজরান চিন্তায়-আতঙ্কে-মন খারাপে-চিকিৎসায়-কখনও অপচিকিৎসায়।

'সিস্ট' কথাটার আক্ষরিক অর্থ ধরতে গেলে তরল ভর্তি আধার বা থলি। সব সময় যে তারা 'টিউমার' হবে, তা নয়।

আসলে যাকে আমরা চোখে দেখতে পাই না, কিন্তু তার সম্বন্ধে শুনতে পাই খুব— তখনই কিছু শোনা কথা, কিছু কল্পনা, কিছু বৈজ্ঞানিক তথ্য মিলে যেন এক কল্পজগতের সৃষ্টি হয়। শুরু হয় টানাপোড়েন। সঠিক ধারণার অভাবে এবং ব্যবসায়ী চিকিৎসকদের হাতে পড়ে জেরবার হতে হয়। আবার কখনও কুচিকিৎসার ফলে সঠিক চিকিৎসা পেতে অনেক দেরি হয়ে যায়।

ওভারি বা ডিম্বাশয় থাকে মেয়েদের শরীরে তলপেটে— জরায়ুর দুই দিকে একটা করে মোট দুটো। ছেলেদের অণ্ডকোষের-ই প্রতিরূপ যেন। এদের কাজ মূলত দুটো। এক, মেয়েলি হরমোন ইস্ট্রোজেন এবং প্রোজেস্টেরন উৎপন্ন করা ও দুই, ডিম্ব নিঃসরণ করা— প্রতি মাসে কোনও একদিন একটা। এর শুরু যখন মেয়েদের যৌবনপ্রাপ্তি ঘটে অর্থাৎ মোটামুটি ১০ বছর বয়স নাগাদ। শেষ হয় মেনোপজ বা রজঃনিবৃত্তির সঙ্গে---- মোটামুটি ৫০ বছর বয়স নাগাদ। অর্থাৎ মেয়েদের জীবনের এই ৪০ বছর ধরে এরা এ কাজ করে যায়। এদের কোষ থেকে নিঃসৃত হরমোনের প্রভাবেই মেয়েলি গড়ন তৈরি হয়— প্রতি মাসে মাসিক বা ঋতুস্রাব হয়, ডিম্ব নিঃসরণ হয়। এবং সেই ডিম্বাণুর সঙ্গে যদি পুরুষের শুক্রাণুর মিলন ঘটে, তবেই তৈরি হয় ভবিষ্যতের সন্তান।

এটা 'ওভারিয়ান' সিস্ট নয়— এর চিকিৎসা মূলত খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনে

ওভারির মাপ মোটামুটি ভাবে ৩ x ২ x ১ সেমি। কন্যাশিশু যখন জন্মগ্রহণ করে তখন তার ডিম্বাশয়ে প্রায় ৬০ লক্ষ ডিম্বাণু কোষ থাকে— যা কমতে কমতে যৌবনপ্রাপ্তির সময় চার লক্ষে পৌঁছয়। এই ডিম্বাণুকে কেন্দ্র করেই তৈরি ফলিকল বা ডিম্বকোষ।

সিস্টের কথা : 'সিস্ট' কথাটার আক্ষরিক অর্থ ধরতে গেলে তরল ভর্তি আধার বা থলি। সব সময় যে তারা 'টিউমার' হবে, তা নয়। অনেক সময় এই 'ফলিকল'গুলো থেকে ডিম্বনিঃসরণ (ওভিউলেশন) না হওয়ায় বা আর কিছু হরমোনজনিত কারণে সেগুলো তরলে ভর্তি হয়ে 'সিস্টের' রূপ ধারণ করে। এদের বিভিন্ন গঠন অনুযায়ী বলা হয় ফলিকুলার সিস্ট বা কর্নাস লুটিয়াম লিস্ট বা থিকা লুটিন সিস্ট ইত্যাদি। সঠিক আক্ষরিক বাংলা প্রতিশব্দের অভাবে এই সব শক্ত ইংরেজি শব্দ ব্যবহারে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এরা কিন্তু 'টিউমার' নয়— ক্ষতিহীন 'ফাংশনাল'—কিছু সময়, ৬ থেকে ৮ সপ্তাহ পর বিশেষ করে মাসিক ঋতুস্রাবের পর পরই এরা অধিকাংশ সময়ে মিলিয়ে যায় নিজের থেকেই। এগুলো থেকে ক্যানসারের ভয় নেই। অবশ্য কদাচিৎ এরা আয়তনে বড় হয়ে পাক খেয়ে গিয়ে পেটে হঠাৎ খুব ব্যথার সৃষ্টি করতে পারে। তখন অপারেশন লাগতেই পারে।

আজকাল যেহেতু আলট্রাসোনোগ্রাফি খুবই সহজলভ্য হয়ে গেছে, তাই সমস্ত 'সিস্টের' নির্ণয়ও অনেক বেশি পরিমাণে হচ্ছে। গর্ভধারণের ক্ষমতা থাকা মহিলাদের (১৬ থেকে ৪০ বছর বয়স) ওভারিয়ান সিস্টের মধ্যে এই ধরনের 'ফাংশনাল' ফলিকুলার সিস্টের সম্ভাবনা সব চেয়ে বেশি। এরা আয়তনে ৫-৬ সেন্টিমিটারের বেশি হয় না। আরও বড় হলে অপারেশনের কথা চিন্তা করা যায়। ল্যাপারোস্কোপিক পদ্ধতিতে করাটাই সাধারণত সুবিধাজনক। তবে কী ভাবে অপারেশন করা হবে, তা একজন সুচিকিৎসকের পারদর্শিতার ওপর ছাড়াই মঙ্গলের।

যে 'সিস্ট' সিস্ট নয় : এছাড়াও আরেক ধরনের 'সিস্ট' নিয়ে কম বয়সী থেকে মাঝ বয়সী মহিলারা আতঙ্কে থাকেন। সোনোগ্রাফির কল্যাণে এর নির্ণয় যত বাড়ছে, ততই এই ওভারিয়ান 'সিস্টের' প্রাদুর্ভাবও বেড়ে চলেছে। যদিও এর সঙ্গে 'সিস্টে'র কোনও সম্পর্ক নেই। সমস্যাসাটা বিশেষ্য (সিস্ট) আর বিশেষণের (সিস্টিক)। মোটামুটি জীবনশৈলী ও পরিবেশগত কারণে পলিসিস্টিক ওভারির সম্ভাবনা বাড়ছে। এই অসুখটার মূল ব্যাপার হচ্ছে ওভারি থেকে নিয়মিত ডিম্ব নিঃসরণ না হওয়া এবং শরীরে পুরুষ হরমোনের আধিক্য ঘটা। এর চিকিৎসা এই প্রতিবেদনের বিষয় না হওয়ায় এ সম্বন্ধে বিশদে আলোচনা করা হচ্ছে না। খালি এইটুকু জ্ঞান থাকা আবশ্যক যে এটা 'ওভারিয়ান' সিস্ট নয়— এর চিকিৎসা মূলত খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনে— শারীরিক স্থূলতা নিয়ন্ত্রণে ও কখনও ওষুধ প্রয়োগের মাধ্যমে। এটার কোনও 'টিউমার' প্রবণতা নেই।

আরেক ধরনের 'সিস্ট' যা মেয়েদের বড়ই যন্ত্রণা বা কষ্ট দেয়, তা হল জনপ্রিয় ডাক্তারি ভাষায় 'চকোলেট' সিস্ট। এটা এন্ডোমেট্রিয়োসিস বলে একটা অসুখের অঙ্গ। এতে সাধারণত তলপেটে ব্যথা অনুভূত হয় বিশেষ করে ঋতুস্রাবের সময়। কষ্ট যদি খুব বাড়ে বা সিস্টের সাইজ যদি বড় হয়, তখন

অপারেশন করতেই হয়। এই অসুখের সমস্যা হচ্ছে, বারবার হওয়া। হরমোন জাতীয় ওষুধ— খাবার বড়ি ও ইনজেকশন ব্যবহার করা যায়। তবে কিছু দিন পর আবার দেখা দেয়। বিবাহিতা মহিলাদের ক্ষেত্রে এই 'সিস্টে'র চিকিৎসার মোটামুটি উদ্দেশ্য থাকে যাতে তিনি গর্ভবতী হন। তবে সম্পূর্ণ ও নিশ্চিত চিকিৎসা বলতে দু'দিকের ওভারিসহ জরায়ু বাদ দেওয়া, বা নিজের থেকেই যখন স্থায়ী ঋতুবন্ধ বা মেনোপজ দেখা দেয়।

ওভারির কিছু সিস্ট আছে, যেগুলো 'টিউমার' গোত্রের এবং এদের ক্যানসার প্রবণতা রয়েছে।

টিউমার সিস্ট : এই যে ক'টা ওভারিতে সিস্টের কথা বলা হল, সেগুলো টিউমার গোত্রের নয়, অর্থাৎ নন-নিওপ্লাস্টিক। মেয়েদের গর্ভসঞ্চার বয়সকালীন অর্থাৎ ১৬-৪০ বছর বয়সের মধ্যে সাধারণত এরাই বেশি সংখ্যায় হয়ে থাকে। এছাড়া, ওভারির কিছু সিস্ট আছে, যেগুলো 'টিউমার' গোত্রের এবং এদের ক্যানসার প্রবণতা রয়েছে।

এই গোত্রের ওভারির 'সিস্টের' বিভিন্ন ধরন থাকে। সেগুলোর নিশ্চিত গঠন বোঝা যায় অপারেশনের পর প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা বা 'বায়োপসি' করে। মোটামুটি ভাবে খুব অল্প বয়সে (যৌবন প্রাপ্তির আগে) কিশোরীদের মধ্যে ও ঋতুবন্ধ বা মেনোপজের পরবর্তী বয়সে বয়স্কা মহিলাদের যে ওভারিয়ান সিস্ট বা টিউমার হয়, তার ক্যানসার প্রবণতা তুলনামূলক ভাবে বেশি।

ওভারিতে ক্যানসারের ঘটনা আগের থেকে বেড়েছে।

ওভারিয়ান সিস্টের ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে, প্রথম প্রথম যখন আয়তনে ছোট থাকে, তখন যেহেতু কোনও উপসর্গ থাকে না, তাই কোনও রকম চিকিৎসা বা রোগ নির্ণয়ের প্রয়োজন অনুভূত হয় না। এমনকী, সাধারণ পরীক্ষাতেও না-ও ধরা পড়তে পারে। তলপেটের অভ্যন্তরে থাকায় একমাত্র যোনিপথের পরীক্ষায় বা আলট্রাসোনোগ্রাফি করে বোঝা যায়। উত্তর চল্লিশ বয়স্কা মহিলাদের নিশ্চয় বছরে একবার এই পরীক্ষার জন্য চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। তবে ওভারিতে ক্যানসার হওয়ার কিছু ঝুঁকিপ্রবণ প্রবণতা চিহ্নিত করা গেছে। যেমন শারীরিক স্থূলতা, বন্ধ্যাত্ব, বা বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসা হিসেবে ডিম্বাণু তৈরি হওয়ার ওষুধের যথেচ্ছ ব্যবহার, পরিবারের নিকট পরিজনের ওভারিতে ক্যানসারের ইতিহাস। এছাড়া টিউমারের আকৃতিপ্রকৃতি অর্থাৎ যদি আয়তনে ৬ সেমির বেশি হয় বা দু'দিকেই থাকে, সিস্ট হলে যদি তার ভিতরে পর্দা থাকে, যদি কিছুটা নরম ও কিছুটা শক্ত হয় ইত্যাদি— এই সবে ক্যানসার হওয়ার সম্ভাবনা বাড়তে পারে। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে বয়স। জীবনের দুই প্রান্তিক বয়সকাল অর্থাৎ কম বয়স বা বেশি বয়স— এই দুই সময়ে ওভারিতে টিউমার বা সিস্ট হলে তার ক্যানসার প্রবণতা বাড়ে। রক্তের কিছু পরীক্ষা, যেগুলোকে ক্যানসার সূচক হিসেবে দেখা হয়, সেগুলোও রোগ নির্ণয়ে কিছুটা সাহায্য করে। যদিও এগুলোর ফলাফল অনেক সময়েই আপেক্ষিক এবং একেক ধরনের টিউমারে একেক সূচকের উপস্থিতি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন।

এত কিছু বলার পর অনেকের মনেই প্রশ্ন থাকতে পারে— ওভারিয়ান সিস্ট বা টিউমারের প্রাদুর্ভাব কি আগের থেকে বেড়েছে? এর এক কথায় উত্তর হয় না। আসলে এখন বিভিন্ন রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যে প্রযুক্তিগত উন্নতি ঘটেছে, তারই ফলস্বরূপ এবং বিশেষ করে আলট্রাসোনোগ্রাফি অনেক সহজলভ্য হওয়ার ফলে এইসব রোগ নির্ণয় অনেক বেশি সংখ্যায় হচ্ছে। এর দু'টো দিক আছে। এক, রোগ নির্ণয় হলে তার সম্বন্ধে অযথা আতঙ্কে না ভুগে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া সহজ হয়েছে। অন্য দিকে, দুই, রোগ সম্বন্ধে আতঙ্কিত মানুষের অহেতুক অপ্রয়োজনীয়, অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসা করা বেড়েছে। তবে, হ্যাঁ, ওভারিতে ক্যানসারের ঘটনা আগের থেকে বেড়েছে। তাই চল্লিশোর্ধ মহিলাদের নিয়মিত স্বাস্থ্যপরীক্ষার অঙ্গ হিসেবে ওভারি নিরীক্ষণকেও আনা প্রয়োজন।

এই রোগ সম্বন্ধে, বা আরও বড় করে বলতে গেলে, নিজের শরীরটা সম্বন্ধে সকলকেই কিছুটা জানতে হবে। তাহলেই যেমন অকারণে হতাশাগ্রস্ত হয়ে ভেঙে পড়তে হবে না, তেমনি অপচিকিৎসারও শিকার হতে হবে না।

লেখক পরিচিতি : ডা. সঞ্জীব মুখোপাধ্যায়, এমবিবিএস, এমডি, স্ত্রীরোগবিদ্যা ও ধাত্রীবিদ্যা বিশেষজ্ঞ ও বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা আন্দোলনের এক নেতৃস্থানীয় কর্মী।

প্রকাশিত হয়েছে

ফাউন্ডেশন ফর হেলথ অ্যাকশনের প্রকাশনা

প্রাথমিক চিকিৎসা, বিষক্রিয়া ও আহতের যত্ন

অনুবাদ : ডা. পুণ্যব্রত গুণ

মূল্য : ১০০ টাকা

কপির জন্য যোগাযোগ করুন : ডা. সিদ্ধার্থ গুপ্ত, ফোন : ৯৮৩১১০০৪৬৪

স্বাস্থ্যবান বাচ্চার ঘাড়ে কালো দাগ?

অ্যাকানথোসিস নিগরিক্যানস হতে পারে

বেশ গাবলু গুবলু বাচ্চা, দেখলেই গাল টিপে আদর করতে ইচ্ছে করে। মা বলছেন, বাচ্চার ঘাড়টা কেমন কালো হয়ে যাচ্ছে। দেখি, তাই তো, ঘাড়ের ওপর, বগলে, কুঁচকিতে, হাঁটু আর কনুই-এর ভাঁজের দিকে, কেমন কালো কালো দাগ। হাত দিয়ে চামড়া টানলে দেখা যাচ্ছে— কালো দাগটা কিন্তু সমান নয়, তার মধ্যে আড়াআড়িভাবে খুব সরু উঁচু নীচু কালো-ধূসর লাইন টানা যেন। অ্যাকানথোসিস নিগরিক্যানস। এই রোগটার কথা জানেন না সাধারণ মানুষ, এমনকী, অনেক ডাক্তারও এটার নাম শোনেননি। অথচ এখন এটা বাচ্চা এবং বড়দের মধ্যে খুব সহজপ্রাপ্য একটা অসুখ— লিখছেন **ডা. জয়ন্ত দাস।**

অ্যাকানথোসিস নিগরিক্যানস। খুব পরিচিত নাম নয়। সত্যি কথা বলতে কী, যে সব রোগীরা আমার কাছে এই রোগ নিয়ে আসেন, তাঁরা কেউই এই নাম শোনেননি। বাচ্চাদের এই রোগটা হয়, বড়দেরও হয়। কিন্তু বড়রা ও বাচ্চাদের মা-বাবারাও এই রোগটার নাম ডাক্তারের কাছে এসেই প্রথম শোনেন।

এমন কিন্তু নয় রোগটা খুব বিরল। রোগটার অনেক ধরন আছে, সে প্রসঙ্গে যথাসময়ে আসা যাবে, কিন্তু এর একটা ধরন বেশ সহজপ্রাপ্য। সেটা হল স্থূলতাজনিত অ্যাকানথোসিস নিগরিক্যানস। সমাজে যত মোটা মানুষ বাড়ছে, মোটাসোটা বাচ্চা বাড়ছে, অ্যাকানথোসিস নিগরিক্যানসের এই ধরনটা তত সংখ্যায় বাড়ছে। আমাদের দেশে মোটা মানুষদের স্বাস্থ্যবান বলাই রীতি, নইলে, আহা, দুঃখ পাবেন যে! বাচ্চাদের মোটা বলা তো একেবারেই অসভ্যতা, মা-বাবা রেগে আগুন তেলে বেগুন হয়ে যান। কিন্তু এই একটা রোগ, যেখানে মোটা হওয়াকে স্বাস্থ্যবান হওয়া বলে ডাকা যাবে না কোনও মতেই। কেন? সে কথা ক্রমশ প্রকাশ্য।

> *সমাজে যত মোটা মানুষ বাড়ছে, মোটাসোটা বাচ্চা বাড়ছে, অ্যাকানথোসিস নিগরিক্যানসের এই ধরনটা তত সংখ্যায় বাড়ছে।*

কী ভাবে চিনবেন?

একেবারে টিপিক্যাল রোগী চেনা শক্ত নয় তেমন। সাধারণত কালো দাগ ঘাড়ের ওপরে ও দুই পাশে হয়, আর হয় বগল ও কুঁচকির কাছে ও হাঁটুর পেছন দিকে অর্থাৎ ভাঁজের দিকে। কনুইয়ের সামনের দিকে অর্থাৎ ভাঁজের দিকেও হতে পারে। ভাল করে বোঝার জন্য হাঁটু বা কনুই ভাঁজ করে দেখুন, কালো দাগটা বেড়ে যাচ্ছে। কালো দাগের ওপরটা খুঁটিয়ে দেখুন। শরীরের চামড়ার ভাঁজ যে দিক বরাবর থাকে, সেই দিক বরাবর খুব সরু সরু কালো আর ধূসর লাইন যেন চলে গেছে। এই লাইনগুলো বগলে, ঘাড়ে আর কুঁচকি ও কনুইয়ের সামনে খুব ভাল বোঝা যায়। অন্যত্র ততটা ভাল বোঝা যায় না।

কালো দাগের ওপর হাত বোলান----ঠিক যেন ভেলভেটের সূক্ষ্ম শুঁয়োর ওপর দিয়ে হাত বোলাচ্ছেন। ভেলভেটের মতো মোলায়েম। স্বাভাবিক চামড়ার চাইতে একটু মোটা এখানকার চামড়া, কিন্তু চামড়া মোটা হলে সাধারণত যেমন কড়া লাগে, তেমন নয় একেবারেই। আতসকাঁচ দিয়ে দেখুন—চামড়ার ওপরে লাইন ধরে উঁচু উঁচু মসৃণ ছোট ছোট সূক্ষ্ম ভাঁজ। ভাঁজের মাঝখানের চামড়াটা

যেন তুলনায় ফ্যাকাসে, তাই কালো চামড়ার ওপর ফ্যাকাসে লাইনের মতো একটা প্যাটার্ন তৈরি হয়। অবশ্য সর্বত্র এই 'প্যাটার্ন' থাকে না। যেমন মুখে, যেখানে অ্যাকানথোসিস নিগরিক্যানস তত বেশি হয় না, সেখানে এই প্যাটার্নও তেমন দৃশ্যমান হয় না। সে কথায় পরে আসব।

ঘাড়ে, বগলে, কুঁচকিতে অ্যাকানথোসিস নিগরিক্যানস-এর সঙ্গে ছোট ছোট চামড়ার গুটি প্রায়ই দেখা যায়। তাকে বলে 'স্কিন ট্যাগ', বা চামড়ায় গুটুলি।

কেন সব ডাক্তারদের এই রোগ চেনা দরকার? দরকার এই জন্য নয় যে এটা দেখতে খারাপ, যদিও সেটা একটা ছোট কারণ তো বটেই।

কাদের হয় অ্যাকানথোসিস নিগরিক্যানস?

আমার আগের কথা থেকে বুঝে গেছেন, মোটাসোটা বাচ্চা ও বড়দের এই রোগটা বেশি হয়। তবে স্থূলত্বই এই রোগের একমাত্র কারণ নয়। অন্য অনেক কারণ আছে। সেগুলোর লিস্টি দিয়ে দিই এইবার :

১। জেনেটিক (বংশানুবাহিত) রোগের অঙ্গ হিসেবে অ্যকানথোসিস নিগরিক্যানস। এটা বিরল, তাই বেশি কথা বলব না,খালি জেনে রাখব এমন একটা ব্যাপার আছে।

২। বিনাইন অ্যাকোয়ার্ড অ্যাকানথোসিস নিগরিক্যানস : ডাক্তারদের অনেক দোষের মধ্যে এই একটা দোষ হল, খটোমটো নাম বড্ড ভালবাসেন তাঁরা। এটা হল আমাদের পরিচিত, মোটা হলে যে অ্যাকানথোসিস নিগরিক্যানস হয়, তারই ডাক্তারি নাম। এ নিয়ে বিশদে বলব আবার।

৩। HAIR-AN সিনড্রোম : মেয়েদের বেশি পুরুষ-হরমোন ক্ষরণ, ইনসুলিন রেজিসট্যান্স, ও অ্যাকানথোসিস নিগরিক্যানস—এই তিনটে লক্ষণের সমাহার। এর সঙ্গে আমাদের চেনা ধরণটার (বিনাইন অ্যাকোয়ার্ড অ্যাকানথোসিস নিগরিক্যানস) খানিক মিল আছে।

৪। অটো-ইমিউন অ্যাকানথোসিস নিগরিক্যানস : বিরল।

৫। ওষুধ থেকে হওয়া অ্যাকানথোসিস নিগরিক্যানস : বিরল, তবে তত বিরল নয়।

৬। ম্যালিগন্যান্সি (ক্যানসার-জাতীয় রোগ)-এর সঙ্গে থাকা অ্যাকানথোসিস নিগরিক্যানস : খুব সহজপ্রাপ্য নয়, তবে খুব বিরলও নয়। এর গুরুত্ব এখানেই যে ক্যানসারটা বোঝা যাবার আগে, ক্যানসারের লক্ষণ ফুটে ওঠার আগেই, এই অ্যাকানথোসিস নিগরিক্যানস দৃশ্যমান হতে পারে। এই ধরনের অ্যাকানথোসিস নিগরিক্যানস অন্য ধরনগুলোর চাইতে একটু অন্যরকম ও বাড়াবাড়ি ধরনের হয়। তাই সেরকম বাড়াবাড়ি ধরনের অ্যাকানথোসিস নিগরিক্যানস কারও হয়েছে দেখলে তাঁর শরীরে কোনও ক্যানসার (বিশেষ করে পাকস্থলী, গ্রাসনালী, মলাশয়, শ্বাসনালী ইত্যাদির) আছে কি না সেটা পরীক্ষা করে দেখাই ভাল। হাতের আঙুলের সামনের দিকে, যেদিকটা দিয়ে আমরা পেন ধরি, সেখানে অ্যাকানথোসিস নিগরিক্যানস হলে সেটা প্রায় সব সময় ক্যানসারের লক্ষণ। কিন্তু সেটা খুব বিরল।

এবার আমরা বিরলতর অ্যাকানথোসিস নিগরিক্যানসের ধরনগুলো নিয়ে আলোচনা করব না। আলোচনা করব বিনাইন অ্যাকোয়ার্ড অ্যাকানথোসিস নিগরিক্যানস, বা সহজ কথায় আমাদের পরিচিত অ্যাকানথোসিস নিগরিক্যানস নিয়ে। আগেই বলেছি মোটা হলে এই ধরনের অ্যাকানথোসিস নিগরিক্যানস হয়। তার হাড়হদ্দ জানার আগে দুটো সাধারণ কথা বলে নিই।

অ্যাকানথোসিস নিগরিক্যানস কথাটার মানে কী?

কথাটা তো আর বাংলা নয়, গ্রিক আর ল্যাটিনে মেশানো হাঁসজারু ভাষা। অ্যাকানথোসিস কথাটা এসেছে গ্রীক অ্যাকান্থো (acantho) থেকে, যার অর্থ হল কাঁটা। আর নিগরিক্যানস (nigricans) শব্দটা ল্যাটিন, মানে হল 'কালো হয়ে যাওয়া।' অ্যাকানথোসিস নিগরিক্যানসের ওপর হাত বোলালে মনে হয় যেন ভেলভেটের ওপর হাত বোলাচ্ছি। মানে ঠিক কাঁটা-কাঁটা নয়, কিন্তু উঁচু নিচু একটা ভাব। আর কালো হয়ে যায় তো বটেই। ডাক্তাররা যা দেখেন সেটার সঙ্গে অ্যাকানথোসিস নিগরিক্যানস নামটা বেশ মানানসই। কিন্তু তা হলে হবে কী, অণুবীক্ষণে যখন চামড়া কেটে দেখা হয়, তখন 'অ্যাকানথোসিস' শব্দটা একটা বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হয়। 'অ্যাকানথোসিস' বলতে বোঝায় ত্বকের একটা বিশেষ স্তরের আণুবীক্ষণিক ভাবে মোটা হয়ে যাওয়া। অ্যাকানথোসিস নিগরিক্যানসে সেটা হয় না। তাই ত্বকবিশেষজ্ঞরা বললেন, 'অ্যাকানথোসিস' কথাটা এখানে ঠিক নয়। আবার 'নিগরিক্যানস' বলতে বোঝায় ত্বকে অতিরিক্ত (মেলানিন) পিগমেন্ট জমা হয়ে যাওয়া।

অণুবীক্ষণে দেখা গেল, অ্যাকানথোসিস নিগরিক্যানসে সেটাও হয় না। তাই ত্বক বিশেষজ্ঞদের মতে, 'অ্যাকানথোসিস নিগরিক্যানস' রোগটার নাম আগাগোড়াই ভুল।

কিন্তু ভুল হলে কী হবে, নামটা তো বহু ব্যবহারের ফলে চালু হয়ে গেছে। সেটাকে তাই ভুল হলেও মেনে নেওয়া হল। আর খালি চোখে দেখলে, এই ত্বকরোগটাকে কালোই দেখায় ('নিগরিক্যানস')। এবং খুব ভালোভাবে দেখলে, অজস্র ভোঁতা কাঁটা ('অ্যাকানথোসিস') যেন লাইন দিয়ে পরপর সাজানো আছে, এমনই মনে হয়। তাই এই নামটা চালু, কিন্তু হয়তো বা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ভুল। তবু এই ভুল কথাটার বাংলা অর্থ আমাদের রোগের লক্ষণ মনে রাখতে সাহায্যই করবে।

স্থূলতা-জনিত অ্যাকানথোসিস নিগরিক্যানসকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি কেন?

সত্যি কথা বলতে কী, এতদিন আমরা এই রোগটাকে বিশেষ গুরুত্বই দিইনি। সে কারণে অধিকাংশ জেনারেল ফিজিশিয়ানরা এই ত্বকরোগটাকে চেনেন না। ত্বকরোগ-বিশেষজ্ঞ বাদে অন্য ডাক্তাররা এই রোগটাকে সনাক্ত করতে পারেন না। কিন্তু সনাক্ত করতে পারা খুব দরকার।

কেন সব ডাক্তারদের এই রোগ চেনা দরকার? দরকার এই জন্য নয় যে এটা দেখতে খারাপ, যদিও সেটা একটা ছোট কারণ তো বটেই। মূল কারণ হল, এটা রোগ হিসেবে যতটা না গুরুত্বপূর্ণ, তার চাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ অন্য রোগের পরোয়ানা হিসেবে। মানে, ত্বকে এই কালো দাগটা থেকেই ভবিষ্যতে ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনার কথা বোঝা যায় এবং তা প্রতিহত করার জন্য চেষ্টা শুরু করা যায়।

বড়দের ক্ষেত্রে যখন স্থূলতা-জনিত অ্যাকানথোসিস নিগরিক্যানস ধরা পড়ে, সাধারণত ততদিনে অনেকটাই দেরি হয়ে গেছে। রোগী ডায়াবেটিস ও তৎসহ অন্যান ব্যাধির (উচ্চ রক্তচাপ, রক্তে উচ্চ কোলেস্টেরল, ইত্যাদি হৃদরোগ বাড়ানোর সম্ভাবনা) শিকার হয়েই গেছেন, বা খুব শিগগির এ সবের শিকার হতে চলেছেন। তবুও তাঁদের বুঝিয়ে শুনিয়ে জীবনযাত্রার খানিক পরিবর্তন করতে পারলে, কিছু কাজ তো হয়ই। কিন্তু আমাদের মূল লক্ষ্য হল বাচ্চারা। বাচ্চাদের স্থূলতা-জনিত অ্যাকানথোসিস নিগরিক্যানস।

সত্যি, এ কেমন সভ্য হলাম আমরা, বাচ্চাদের খেলার সময় চুরি করে নিল প্রতিযোগিতা আর বিজ্ঞাপন!

বাচ্চাদের স্থূলতা-জনিত অ্যাকানথোসিস নিগরিক্যানস কেন খুব গুরুত্বপূর্ণ?

দুটো কারণে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, শহরাঞ্চলে একটু সম্পন্ন মা-বাবার বাচ্চারা খুব বেশি সংখ্যায় স্থূলত্বে ভুগছে। দুই, এদের সময়ে সঠিক পরামর্শ দিলে সারা জীবন অসুস্থতার বদলে এরা একটা খুব সুস্থ স্বাভাবিক জীবন পেতে পারে।

চিকিৎসা

স্থানীয় চিকিৎসা বলতে লাগানোর ভিটামিন-এ মলম লাগানো, এবং ইউরিয়া, ল্যাকটিক অ্যাসিড, স্যালিসাইলিক অ্যাসিড ইত্যাদি যে সব মলমে চামড়ার ওপর স্তর উঠে আসে, তেমন মলম লাগানো। এগুলো সাবধানে লাগাতে হয়। সব ত্বকে এ সব সমান সহ্য হয় না, লাগালে জ্বালা করে, ছাল ওঠে। তাই শুরুতে কম জোরালো মলম, এবং / অথবা কম বার লাগানো উচিত। সহ্য হলে বেশি লাগানো যেতে পারে।

কিন্তু এই সব চিকিৎসায় তো ত্বকের মূল সমস্যা যাবে না। চামড়া যে ভেতর থেকে মোটা হয়ে চলেছে, সেটার প্রতিকার করতে গেলে কারণ দূর করতে হবে। স্থূলতা-জনিত অ্যাকানথোসিস নিগরিক্যানসে ওজন কমাতে হবে। অন্য রোগের সঙ্গে যে অ্যাকানথোসিস নিগরিক্যানস হচ্ছে, তার প্রতিকার করতে গেলে সেই রোগটাকে সারাতে হবে। সেটার বিশদে আমরা এখানে যাব না।

কিন্তু আরেকবার বলব, স্থূলতা-জনিত অ্যাকানথোসিস নিগরিক্যানস-এর সংখ্যাই বেশি, আর তাদের স্থূলতা কমানো দরকার—কেবল চামড়ার দাগ দূর করার জন্য নয়, ভবিষ্যতে ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হার্টের অসুখ—এসব আটকানোর জন্যও।

দরকার পরিমিত ঠিকঠাক আহার, আর শরীরচর্চা। ব্যাপারটা সহজ, আর খরচও বেশি নয়। কিন্তু এই কথাটা যখন গাবলু গুবলু বাচ্চার মাকে বলি, তিনি বলেন, ডাক্তারবাবু, পাঁচ বছর বয়স থেকেই খেলার সময় নেই। খেলার মাঠ নেই। খেলার সাথীরা বই, মাস্টার, আর টিভি নিয়ে ব্যস্ত, কে খেলবে।

সত্যি, এ কেমন সভ্য হলাম আমরা, বাচ্চাদের খেলার সময় চুরি করে নিল প্রতিযোগিতা আর বিজ্ঞাপন!

লেখক পরিচিতি : ডা. জয়ন্ত দাস, এমবিবিএস, এমডি, কলকাতার একটা বেসরকারি ইনস্টিটিউটে ত্বকরোগের অধ্যাপক। হাওড়ায় শ্রমজীবী মানুষের জন্য তৈরি এক ক্লিনিকের সঙ্গে যুক্ত।

বা ণি জ্যি ক ন য়, মা ন বি ক

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য, রোগ, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও সমাজ নিয়ে আপনার সহমর্মী দ্বিমাসিক বাংলা পত্রিকা

প্রাপ্তিস্থান : পাতিরাম, বুকমার্ক, পিপলস বুক সোসাইটি, বইচিত্র, মনীষা গ্রন্থালয়, নিউ হরাইজন বুক ট্রাস্ট, অমর কোলের স্টল (বিবাদি বাগ), এস কে বুকস (উল্টোডাঙ্গা), শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্য কেন্দ্র (চেঙ্গাইল), লেখনী, ২/৪৬ নাকতলা কলকাতা ৭০০ ০৪৭, কল্যাণদার স্টল (রাসবিহারী মোড়), মেডিকেল কলেজ এমার্জেন্সি গেটের বাইরের স্টল, দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি, ধানসিঁড়ি (রায়গঞ্জ), বইকল্প (ঢাকুরিয়া), পুষ্প নিউজ এজেন্সি (মালদহ, ফোন ৯৯৩২৯৬৭৯৯১), জাতিস্মর ভারতী (জলপাইগুড়ি ফোন ৯৯৩২৩৫৪৯৫৮), প্রয়াস মল্লভূম (লোকপুর, বাঁকুড়া, ৯৪৩৪২২৭৪৯৯), মাধব পেপার স্টল, বালুরঘাট বাসস্ট্যান্ড ৯৯৩২৪৫৫২৪৪), প্রদীপন গাঙ্গুলি (দার্জিলিঙ ৮৫৩৫৮৯৫৩৯২), সোমা দত্ত (হাওড়া ৮৯২৬২৮৬২৬৪) শিয়ালদহ ও হাওড়া মেন সেকশানের বিভিন্ন স্টেশনের বই-এর স্টলে।

পাঠক ও লেখক পত্রিকার লেখার বিষয়ে যোগাযোগ করুন ৯৮৩০৯২২১৯৪, ৯৩৩১০১২৫৩৭
পত্রিকা পাবার জন্যে যোগাযোগ করুন ৯৮৩০৮৮৬৪৪১
ইমেল : swasthyerbritte@gmail.com

With Best Compliment
from

A. N. Pharmacia Laboratories Pvt. Ltd.

Celebrating 30 Years

Recognised Nationally And Internationally

সর্পদংশন

পর্ব-২

আগের সংখ্যায় (স্বাস্থ্যের বৃত্তে আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০১৪) আমরা দেখেছি আমাদের দেশে সর্পদংশনের সামগ্রিক চিত্র! আমরা তার বিশ্লেষণ করেছি, সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করে তার প্রতিকার খোঁজার চেষ্টা করেছি। আমরা জানার চেষ্টা করেছি, কী ভাবে সাপের কামড় ঠেকাতে হয় বা কামড় খেলে কী কী করতে হয়। আজকের আলোচনা সাপের বিষ ও তার প্রতিষেধক নিয়ে—লিখছেন **ডা. শেখ মাসুম।**

সাপের বিষ প্রধানত তিন প্রকারের

১। নিউরোটক্সিক (Neurotoxic) বা স্নায়ু আক্রমণকারী - এই সাপগুলো 'Elapidae' গোত্রের; আমাদের দেশে উল্লেখযোগ্য সাপগুলো হয় Cobra-পরিবার (গোখুরা, কেউটে / খড়িশ, শঙ্খচূড়) অথবা Krait-পরিবার (কালাজ, শাঁখামুটি)-এর। কিছু সামুদ্রিক সাপও (Elapidae গোত্র, Hydrophiinae উপগোত্র) এই দলে পড়ে। এই বিষ স্নায়ুকে আক্রমণ করে, স্নায়ু সন্ধি (synapse)-র ওপর কাজ করে স্নায়ুতে তড়িৎ প্রবাহ রোধ করে তাকে অক্ষম করে দেয়। সেটা কখনও স্নায়ু-সন্ধির পূর্ববর্তী পর্দায় কখনও বা স্নায়ুসন্ধির পরবর্তী পর্দায় (Presynaptic কিংবা Post-synaptic) হতে পারে। ফলে সমস্ত পেশি ধীরে ধীরে অকেজো (Paralysis) হতে থাকে, পরিশেষে শ্বসনের পেশিগুলো আক্রান্ত হলে শ্বাস বন্ধ হয়ে মৃত্যু ঘটে।

২। সাইটোলাইটিক (Cytolytic) বা কোষবিদীর্ণকারী : এই সাপগুলো প্রধানত 'Viperidae' গোত্রের। কিছু 'Colubridae' গোত্রের সাপও এই ধরনের বিষ বহন করে, কিন্তু সেগুলো আমাদের দেশে পাওয়া যায় না। ভাইপার গোত্রের সাপ (চন্দ্রবোড়া, ফুরসা, পিট্ ভাইপার) যে বিষ প্রয়োগ করে তার ক্রিয়া একাধিক জটিল প্রকারে ঘটে—

(ক) কামড়ের জায়গায় (Local effect) একের পর এক কোষ বিদীর্ণ করে সেই কলায় ঘা ও পচন ঘটায়, সঙ্গে কলাটিতে প্রচণ্ড পরিমাণে প্রদাহ (Inflammation) ঘটায়।

(খ) রক্তে মিশে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে পরবর্তী ঘটনাগুলো ঘটায় (Systemic effect)।

(I) প্রথমে নানা ক্ষুদ্র রক্তবাহী নালিকাতে ছোট ছোট জমাট রক্ত সৃষ্টি করে (microthrombi), এর ফলে নানা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গে রক্ত চলাচল ব্যহত হয়ে তা ক্ষতিগ্রস্ত হয় (Ischemic injury)। একই সঙ্গে রক্ততঞ্চনে প্রয়োজনীয় সমস্ত উপাদান ব্যবহৃত হয়ে যাওয়ার ফলে এর পরবর্তী সময়টাতে রোগীর শরীরে আর রক্ত তঞ্চনের ক্ষমতা থাকে না — ফলে শরীরে বিভিন্ন জায়গায় রক্তক্ষরণ হতে থাকে। এই ঘটনাটি ''Disseminated intravascular coagulation'' বা ''DIC'' নামক একটা ঘটনার সমতুল্য যেখানে একই পদ্ধতিতে রোগীর রক্ততঞ্চনের ব্যহত হয়ে রক্তপাত ঘটতে থাকে। এ ছাড়াও এই বিষে এমন কিছু উপাদান থাকে যা সরাসরি রক্ততঞ্চন ব্যাহত করে।

(II) রক্তেও বিষটি কোষ বিদারণ করতে থাকে। লোহিত কণিকা ফেটে হিমোগ্লোবিন নামক রঞ্জক নির্গত হয়, এই হিমোগ্লোবিন বৃক্কের সূক্ষ্ম জালকগুলোর ছিদ্রগুলোতে জমা পড়ে— ফলে বৃক্কের স্বাভাবিক ক্রিয়া ব্যহত হয়।

(III) রক্তবাহিকা নালীগুলোর গায়েও কোষ বিদারণ ঘটতে থাকে, ফলে নালীগুলোর গায়ে ছোট ছোট অজস্র ছিদ্র সৃষ্টি হয়ে তা দিয়ে রক্ত / রক্তরস নিঃসৃত হতে থাকে। রক্ততঞ্চন ব্যহত থাকায় এই ক্ষরণ অবাধে চলতেই থাকে।

(IV) এই বিষের কিছু উপাদান রক্তনালীগুলোর সম্প্রসারণ ঘটিয়ে রক্তচাপ কমিয়ে দেয়। রক্ত / রক্তরস ক্ষরণের প্রক্রিয়া এর সঙ্গে যুক্ত হলে রক্তচাপ ভয়ানক রকমের হ্রাস পেতে পারে। তার ওপরে প্রদাহ জনিত কিছু ক্ষরিত পদার্থ (Inflammatory mediators) এই ঘটনাটিকে আরও ত্বরান্বিত করতে পারে।

এই প্রকার সর্পাঘাতে মৃত্যু প্রধানত তিন ভাবে হতে পারে—

(I) উপরোক্ত পদ্ধতিগুলোর মাধ্যমে রক্তচাপ কমতে কমতে এমন পর্যায়ে চলে গেল যে রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়াটাই বিকল হয়ে গেল (circulatory failure বা shock)।

(II) শরীরের ভিতরে কোনও গহ্বরে / কোনও গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বা শরীরের বাইরে মাত্রাতিরিক্ত রক্তপাত ঘটে মৃত্যু হতে পারে।

(III) কিডনি বা বৃক্কের জালকগুলোতে হিমোগ্লোবিন জমে জমে কিডনি বিকল হয়ে মৃত্যু ঘটতে পারে (Acute renal failure)।

৩। **মায়োটক্সিক** (Myotoxic) বা পেশিকে আক্রমণকারী : এই দলের প্রায় সব সাপই সামুদ্রিক সাপ (Hydrophiinae উপগোত্র)। মারাত্মক ধরনের

বিষধর সাপ হওয়া সত্ত্বেও এই সাপগুলো বেশির ভাগই শান্ত প্রকৃতির; তাছাড়া মানুষের সংস্পর্শে এদের আসার সুযোগও খুবই কম হয়। মৎস্যজীবীরা (জালে সাপ আটকা পড়লে) বা মুক্তাডুবুরিরা কালেভদ্রে আক্রান্ত হয়, বিশেষত আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের নিকটবর্তী প্রবালদ্বীপগুলোর কাছাকাছি গেলে। মাত্র তিন-চারটে প্রজাতির সামুদ্রিক সাপই একটু হিংস্র হয়। একমাত্র "সামুদ্রিক কালাজ" (Sea-Krait বা Laticauda sp.) স্থলে উঠে আসতে পারে। যে কোনও সামুদ্রিক সাপকে স্থলে আনা হলে অবশ্য তাদের কামড়ানোর প্রবণতা বেড়ে যায় (অপরিচিত পরিবেশে ভীত হয়ে)।

যদিও এক ধরনের সাপ প্রধানত একটা ধরনেরই বিষ বহন করে, কিন্তু অল্প মাত্রায় অন্যান্য ধরনের বিষের উপাদানও তাতে প্রায় সব সময়ে পাওয়া যায়।

এই সাপের বিষ পেশিকে আক্রমণ করে পেশিকোষগুলোকে বিদীর্ণ করতে থাকে (Rhabdomyolysis); শরীরের সমস্ত পেশি শক্ত (Spasm) হয়ে যায় ও প্রচণ্ড যন্ত্রণা হয়। চোয়াল শক্ত হয়ে যায় (Trismus), যার ফলে টিটেনাস বা ধনুষ্টঙ্কারের সঙ্গে ভুল হতে পারে। পেশিকোষ বিদারণের ফলে মায়োগ্লোবিন নামক রঞ্জক নির্গত হয় ও বৃক্কের জালিকাতে জমা হয়, অতি মাত্রায় ঘটলে বৃক্ক বিকল হয়ে মৃত্যু ঘটে। শ্বসনের পেশিগুলোতে টান ধরেও (Spasm) মৃত্যু ঘটতে পারে।

যেহেতু তৃতীয় ধরণের সাপের (মায়োটক্সিক) কামড় এদেশে খুবই বিরল, আমাদের আলোচনা প্রধানত প্রথম দুই ধরনের সাপ নিয়েই থাকবে।

উল্লেখযোগ্য কিছু বিষয় :

১। প্রায় সমস্ত বিষেই Hyaluronidase নামক একটা উপাদান থাকে যা বিষকে কলার গভীরে ছড়িয়ে যেতে সাহায্য করে।

২। যদিও এক ধরনের সাপ প্রধানত একটা ধরনেরই বিষ বহন করে, কিন্তু অল্প মাত্রায় অন্যান্য ধরনের বিষের উপাদানও তাতে প্রায় সব সময়ে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ শঙ্খচুড়-এর বিষ প্রধানত 'নিউরোটক্সিক' হলেও এতে 'সাইটোলাইটিক' উপাদানও ভাল মাত্রাতেই পাওয়া যায়। আবার চন্দ্রবোড়ার বিষ প্রধানত 'সাইটোলাইটিক' হলেও কিছু এলাকায় এর বিষে 'নিউরোটক্সিক' (Presynaptic) উপাদান থাকে।কিংবা সামুদ্রিক সাপে 'নিউরোটক্সিক' ও 'মায়োটক্সিক' দুই ধরনের উপাদানই বিভিন্ন অনুপাতে থাকতে পারে। এটা জেনে রাখা এই জন্য দরকার যাতে একটা বিশেষ প্রকারের সাপের কামড়ে অন্য রকম উপসর্গের উপস্থিতি যেন বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে না পারে।

প্রথমে চোখ বন্ধ হয়ে আসবে, চোখের পাতা ভারী হয়ে নুয়ে পড়তে চাইবে

৩। 'নিউরোটক্সিক' কিছু সাপের বিষে কখনও কখনও এমন কিছু উপাদান থাকে যা হৃদপেশির মধ্যের তড়িৎপ্রবাহ বন্ধ করে দেয় যে ভাবে সে বিষ স্নায়ুর তড়িৎ প্রবাহ বন্ধ করে (Cardiotoxin)। ফলে হৃদযন্ত্র হঠাৎ থেমে গিয়ে মৃত্যু ঘটতে পারে (Cardiac arrest)। এছাড়াও Cytolytic বা Myotoxic বিষে লোহিত কণিকা / পেশিকোষ বিদারণের ফলে প্রচুর পরিমাণে পটাশিয়াম (K+) নির্গত হয়, রক্তে অতিরিক্ত পটাশিয়াম বেড়ে গেলেও হঠাৎ হৃদযন্ত্র থেমে যেতে পারে।

সর্পাঘাতের উপসর্গ লক্ষণ সমূহ :

১। **'সাইটোলাইটিক' বিষযুক্ত** ('Viperidae' গোত্রের) সাপ হলে, উপসর্গ ও লক্ষণগুলো হল—

- ক্ষতস্থানে ফোলা ও ব্যথা, ফোস্কা / ঘা হয়ে যাওয়া, পচন শুরু হওয়া ইত্যাদি;
- ক্ষতস্থানের নিকটতম লসিকাগ্রন্থিতে ফোলা ও ব্যথা (যেমন হাতে যে কোনও জায়গায় কামড়ালে বগলের গ্রন্থিগুলো ও পায়ে যে কোনও জায়গায় কামড়ালে কুঁচকির গ্রন্থিগুলো ফুলে যাবে ও ব্যথা হবে);
- নাক দিয়ে অথবা দাঁতের গোড়ায় / মাড়ি থেকে রক্তপাত;
- প্রচণ্ড বমি হওয়া;
- কাশি / বমিতে রক্ত আসা, প্রস্রাবে / পায়খানার সঙ্গে রক্ত আসা;
- হঠাৎ শুরু হওয়া পেটযন্ত্রণা (সময়বিশেষে যে যন্ত্রণাটা পিঠের দিকে ছড়িয়ে পড়ে);
- চামড়ার নিচে অথবা নখের ভিতর / চোখের নিচের পাতার ভিতরের দিকে যে সূক্ষ্ম আবরণীকলা থাকে তার তলায় ছোট ছোট রক্তপাতের দাগ, চোখের সাদা অংশে কখনও কখনও জমাট রক্ত দেখা যাওয়া;
- লাল প্রস্রাব হওয়া অথবা প্রস্রাবের পরিমাণ কমে যাওয়া / একদম বন্ধ হয়ে যাওয়া (বৃক্ক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় লক্ষণ)—ফুরসার ক্ষেত্রে সাধারণত হয় না;
- কোনও এক দিক ধরে বিকলাঙ্গ ('Paralysis') হয়ে যাওয়া (মস্তিষ্কে রক্তপাতের লক্ষণ);
- সমস্ত পেশি জুড়ে যন্ত্রণা (পেশি বিদারণের ফল)।

২। **'নিউরোটক্সিক' বিষযুক্ত** ('Elapidae' গোত্রের) সাপ হলে উপসর্গ / লক্ষণগুলো হল—

- ক্ষতস্থানে ফোলা, ব্যথা, ঘা (কালাজ / শাঁখামুটির ক্ষেত্রে হয় না);
- পেশি বিকল হওয়া (Paralysis) শুরু হলে তার লক্ষণগুলো একের পর এক দেখা যাবে — মনে রাখা দরকার যে এই 'প্যারালিসিস' একটা বিশেষ নিয়ম মেনেই সাধারণত হয়ে থাকে— এটা ওপরের পেশিগুলোকে প্রথমে বিকল করে ধীরে ধীরে নিচে নামতে থাকে (Descending Paralysis)। সর্ব প্রথম প্রভাবিত হবে চোখের পাতার পেশি, তারপর চোখের পেশি, তারপর মুখ ও গলার, তারপর বুক ও শ্বসনের পেশি।
- প্রথমে চোখ বন্ধ হয়ে আসবে, চোখের পাতা ভারি হয়ে নুয়ে পড়তে চাইবে;
- তারপর চোখের দৃষ্টি তেরছা হয়ে যাবে, রোগী একটা জিনিস দুটো

দেখবে;

- তারপর মুখ ও গলা— কথা জড়িয়ে আসবে, লালা ঝরতে থাকবে, ঢোক গিলতে অসুবিধা হবে, রোগী বিছানা থেকে ঘাড় শক্ত করে মাথা উঁচু করতে পারবে না।
- তারপর শ্বসনের পেশি আক্রান্ত হলে প্রথমে রোগীর শ্বসনের পদ্ধতি বদলে যাবে অদ্ভুত ভাবে— যখন বুক উঁচু হবে নিশ্বাসের সঙ্গে তখন পেট ঢুকে যাবে, আর প্রশ্বাসে যখন বুক নিচু হবে তখন পেট ফুলে উঠবে (Paradoxical respiration)। ক্রমে শ্বসন মন্থর হবে, রোগীর শরীরে অক্সিজেনের অভাব ঘটবে ও রোগী জ্ঞান হারাবে। এই অবস্থায় কৃত্রিম শ্বসন যন্ত্র বা 'ভেন্টিলেটর'-এর সাহায্যে শ্বাস-প্রশ্বাস চালু না রাখলে মৃত্যু অনিবার্য।

শ্বসনের পেশি আক্রান্ত হয়েছে কিনা বোঝার জন্য রোগীকে এক নিশ্বাসে ১ থেকে ২৫ গুণতে বলুন

এখানেও বিশেষ কিছু মনে রাখার বিষয় আছে :

(ক) উপরোক্ত লক্ষণগুলো সব যখন দেখা যায়, তখন খুব দেরি হয়ে গিয়েছে, আবার বিষক্রিয়ার লক্ষণ না দেখেই প্রতিষেধক দেওয়ার যুক্তি নেই— প্রতিষেধক অত্যন্ত দামী, দুর্লভ, এবং প্রচুর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার (যাদের মধ্যে কয়েকটা প্রাণঘাতী)-র সম্ভাবনা বহন করে। তাই বিষক্রিয়ার প্রথম লক্ষণটা কী সেটা জানা খুবই জরুরী।

(১) স্নায়ু আক্রান্ত হওয়ার প্রথম লক্ষণ হল চোখের পাতা ভারী হয়ে চোখ বুজে আসা।

(২) ঘাড়ের স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বোঝা যায় যখন রোগী বিছানা থেকে মাথা তুলতে পারে না, আর ঘাড়ের স্নায়ু আক্রান্ত হওয়ার অর্থ--- এর পর শ্বসনের পেশির পালা।

(৩) শ্বসনের পেশি আক্রান্ত হয়েছে কি না, বোঝার জন্য রোগীকে এক নিশ্বাসে ১ থেকে ২৫ গুনতে বলুন (Single breath count)। যদি ২০ বা তার আগেই থেমে যায় তা হলে বুঝতে হবে শ্বসনের পেশি আক্রান্ত হয়েছে।

(৪) রক্ততঞ্চন বিঘ্নিত হয়েছে কি না, সেটা বোঝার জন্য একটাই রক্ত পরীক্ষা আছে— ২০WBCT বা ''২০ মিঃ হোল্ ব্লাড্ ক্লটিং টাইম।'' রোগীর রক্ত একটা কাঁচের টিউবে ২০ মিনিটের মধ্যে জমাট বাঁধে কি না দেখা হয়। এই পরীক্ষাটা সহজ ও নির্ভুল এবং এটাই সর্বপ্রথম রক্ততঞ্চন বিঘ্নিত হওয়ার সঙ্কেত দিতে সক্ষম।

(খ) কালাজ-এর কামড় বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন রাখে—

যেহেতু কালাজ-এর কামড়ে কোনও ফোলা / ব্যথা এমনকি কিছু ক্ষেত্রে কোনও ক্ষতচিহ্ন পর্যন্ত থাকে না, মাঝেমধ্যেই এই কামড় নজর এড়িয়ে যায়। ''ঝোপের মধ্যে কী একটা কামড়াল যেন, কোনও দাগ / কাটা / রক্ত ছিল না'', বা কখনও 'রাত্রে মাটিতে বিছানা করে শুয়ে ছিলাম, বিছানায় কী একটা কামড়েছিল বুঝতে পারিনি'' — গোছের গল্প মাঝেমাঝেই শোনা যায়। এদের ক্ষেত্রে অনেক সময় লক্ষণগুলো চিনতে খুব অসুবিধা হয় যেমন—

- হঠাৎ প্রচণ্ড পেটব্যথা / গলাব্যথা যার কারণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, বা
- সকালে ঘুম থেকে উঠে হাত-পা অসাড় / বিকল হয়ে যাওয়া যা আপাত দৃষ্টিতে ''স্ট্রোক' বলে ভুল হতে পারে।

না জানা থাকলে তাই আগে থেকে সন্দেহ জাগা অসম্ভব। তাই ''High index of Suspicion'' রাখা প্রয়োজন— আর সন্দেহ হলেই ''চোখ ভারী হয়ে বুজে আসা'' লক্ষণটির জন্য সতর্ক থাকা। আর সেই লক্ষণ পেলে তার ভিত্তিতেই প্রতিষেধক শুরু করতে হতে পারে যদি অন্য কোনও কারণ / ব্যাখ্যা খুঁজে না পাওয়া যায়।

ঘোড়ার রক্তরস থেকে এটা তৈরি করা হয় বলে বিশুদ্ধিকরণের পরেও কারোর কারোর এই প্রতিষেধক থেকে অ্যালার্জি হতে পারে।

এবার আসব সাপের বিষের প্রতিষেধক নিয়ে আলোচনায়। কিন্তু তার আগে জেনে নিতে হবে ''তীব্র বিষ মহাচার'' বা ''তীব্র মহাচার'' সম্পর্কে। সাপ নিয়ে আলোচনায় সর্বপ্রথম যে নাম উঠে আসে তা হল এই ''তীব্র মহাচার'' (THE BIG FOUR)।

আমাদের দেশে সাপের কামড়ে মৃত্যুর প্রায় সবগুলোর ক্ষেত্রেই অভিযুক্ত আসামী এই চারটির একটা। এরা হল—

(ক) গোখুরা (Common Cobra / Spectacled Cobra; *Naja naja*)

(খ) কালাজ (Common Krait; *Bungarus caeruleus*)

(গ) চন্দ্রবোড়া (Russel's viper; *Daboia russelii*)

(ঘ) ফুরসা (Sano-scaled viper; *Echis carinatus*)

প্রতিষেধক : আমাদের দেশে যে সর্পবিষ প্রতিষেধক পাওয়া যায় তা একই সঙ্গে এই চারটি সাপের বিষের ক্ষেত্রেই কাজ দেয়— তাই এর নাম ''পলিভ্যালেন্ট অ্যান্টিস্নেক ভেনিন'' (Polyvalent anti-snake venin)। এটা তরল বা পাউডার রূপে তৈরি হতে পারে। তরল প্রতিষেধক রেফ্রিজারেটরে কোল্ড চেনে রাখতে হয়। পাউডার রূপটি সাধারণ ঠাণ্ডা জায়গায় রোদের থেকে আড়ালে রাখলেই চলে, তাই দুর্গম জায়গায়, যেখানে বিদ্যুৎ সরবরাহ অনিয়মিত সেসব জায়গায় পাউডার রূপই উপযোগী।

এদের ক্ষেত্রে অনেক সময় লক্ষণগুলো চিনতে খুব অসুবিধা হয়

এই প্রতিষেধক শিরা দিয়ে দেওয়া হয়। ঘোড়ার রক্তরস থেকে এটা তৈরি করা হয় বলে বিশুদ্ধিকরণের পরেও কারোর কারোর এ থেকে অ্যালার্জি হতে পারে। ১ শিশি (১০ মিলি) প্রতিষেধক নিষ্ক্রিয় করে

(i) ৬ মিগ্রা গোখুরা বিষ,

(ii) ৪.৫ মিগ্রা কালাজের বিষ,

(iii) ৬ মিগ্রা চন্দ্রবোড়ার বিষ,

(iv) ৪.৫ মিগ্রা ফুরসার বিষ।

কামড় যদি ওপরের চারটির বাইরের কোনও বিষধর সাপ হয়, তা হলে এই প্রতিষেধকে কাজ হবে না; খুব কাছাকাছি প্রজাতি হলে আংশিক কাজ হতে পারে। তবে মনে রাখতে হবে যে অন্য বিষধর সাপের কামড় বিরল, এবং যেহেতু এই প্রতিষেধকেই বৃহত্তর অংশের সর্পাঘাত চিকিৎসা করা সম্ভব, এই প্রতিষেধক প্রাথমিক স্তরে পৌঁছানোর দিকেই আমাদের মনোযোগ রাখা দরকার।

প্রাথমিক স্তরে সাপের কামড়ের চিকিৎসা—

● প্রাথমিক স্তরে সর্পাঘাতের চিকিৎসা করতে প্রয়োজন হয়—

(i) **প্রতিষেধক** - শুধু উপস্থিত থাকলেই হবে না, যথেষ্ট পরিমাণে মজুত থাকতে হবে।

** একটি প্রাথমিক স্তরের কেন্দ্রে যে কোনও সময়ে ক'টি শিশি মোতায়েন থাকা উচিত, তার একটা সহজ হিসাব আছে—

(xd X1.2)t ; x = প্রতিমাসে গড়ে কতগুলো সর্পাঘাত বিষক্রিয়া নিয়ে ওই কেন্দ্রে আসে,

d = রোগী প্রতি গড়ে ক'টি শিশি লাগে,

t = মজুত থাকা প্রতিষেধকের ভাণ্ডার পুনরায় পূর্ণ করতে যত মাস সময় লাগে।

(ii) আনুষঙ্গিক/সহযোগী যন্ত্রপাতি বা সামগ্রী

- শিরায় ওষুধ / প্রতিষেধক দেওয়ার উপকরণ
- কাঁচের টিউব, সিরিঞ্জ;
- অক্সিজেন, 'সাকার' মেশিন ইত্যাদি।

(iii) অ্যালার্জি মোকাবিলা করতে প্রয়োজনীয় যা যা ব্যবস্থা / সামগ্রী দরকার তা উপস্থিত থাকাটা অত্যাবশ্যক।

(iv) নিওস্টিগ্‌মিন ইঞ্জেকশন : আবশ্যক না হলেও থাকাটা বাঞ্ছনীয়।

(v) ফ্রুসেমাইড ইঞ্জেকশন : আবশ্যক না হলেও থাকাটা বাঞ্ছনীয়।

(vi) এবং **সর্বোপরি যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ডাক্তার : প্রাথমিক স্তরে সবচেয়ে দুষ্প্রাপ্য জিনিস!**

পরিশেষে, প্রথম সংখ্যার সারকথাটাই আর একবার মনে করিয়ে দিই— সতর্ক থাকুন— অঘটন এড়াতে। প্রস্তুত থাকুন — অঘটন একান্তই ঘটে গেলে বড় রকম ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে।

স্বাস্থ্যের বৃত্তে'র আগামী সংখ্যায় আমরা কিছু সাপ চেনবার চেষ্টা করব।

লেখক পরিচিতি : ডা. শেখ মাসুম, এমবিবিএস, শ্রমজীবী মানুষের জন্য গড়ে ওঠা এক ক্লিনিকে আংশিক সময়ের চিকিৎসক।

স্বাস্থ্যের বৃত্তে-র গ্রাহক হোন, বিজ্ঞাপন জোগাড় করে দিন। সব রকমের যোগাযোগের জন্যে

৯৮৩০৯২২১৯৪, ৯৩৩১০১২৫৩৫।

দেবতার ভর, পীরের ভর

অলকেশ মণ্ডল

আজ শনিবার, তাই ভিড়টা একটু বেশি। মন্দিরের পাশে কালুর চায়ের দোকানের এক কেটলি চা সকাল ন'টাতেই শেষ হয়ে গেছে। দ্বিতীয় বারেরটাও শেষ হতে চলেছে। এখনও অনেকে আসছে। মন্দিরে গিয়ে ১৬ আনা বা ১ টাকা জমা দিয়ে নম্বরের টিকিট নিয়ে কালুর দোকানে চা টিফিন খেয়ে ইতস্তত ঘুরে ফিরে বসে জিরিয়ে গল্প করে সময় কাটাচ্ছে বহু মানুষ। মূল নায়িকা শোভারাণি এখন রান্নায় ব্যস্ত। রান্নাবাড়া সেরে দুপুর নাগাদ পূজোয় বসবে। সকলেই জানে, আজকে দু'জন মা আসবে তার শরীরে। একে একে মা কালী আর মা মনসা দফায় দফায় ভর করবে তার ওপর। দু'জন সহযোগী আছে তার। নিজের বিধবা দিদি মায়ারাণি এবং বর্তমান স্বামী পরিতোষ। মায়ারাণি মন্দিরের নুড়ি পাথরের বিগ্রহ, কালী মনসার বাঁধানো ছবি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে আগামী পূজোর জোগাড়ে ব্যস্ত। আর পরিতোষ নতুন আগন্তুক এলে তার থেকে ১৬ আনা আদায় নিয়ে একটা নম্বরের টিকিট দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছে, ভর শুরু হলে কী কী করণীয় ইত্যাদি। এ ছাড়া, পরিতোষ ও মায়ারাণি সর্বদাই কালী ও মনসার গুণকীর্তন গেয়ে চলেছে। জনতার আগমনের উদ্দেশ্য জেনে নিয়ে তাদের আশ্বস্ত করার ফাঁকে সকলকে শুনিয়ে নানা কথাবার্তা বলছে—দামি গাড়ি করে কবে কোন্ ভক্ত এখানে এসেছিল। 'সেই দূর বর্ধমান থেকেও ভক্তরা মাঝে মধ্যেই আসে।' কবে কার রোগ ভাল হওয়ায় মায়ের নাকে সোনার নথ পরিয়ে দিয়ে গেছে। 'মায়ের যদি দয়া হয় তবে ক্যানসারও ভাল হয়ে যায়।' 'মায়ের অসাধ্য কিছুই নেই'— ইত্যাদি ইত্যাদি।

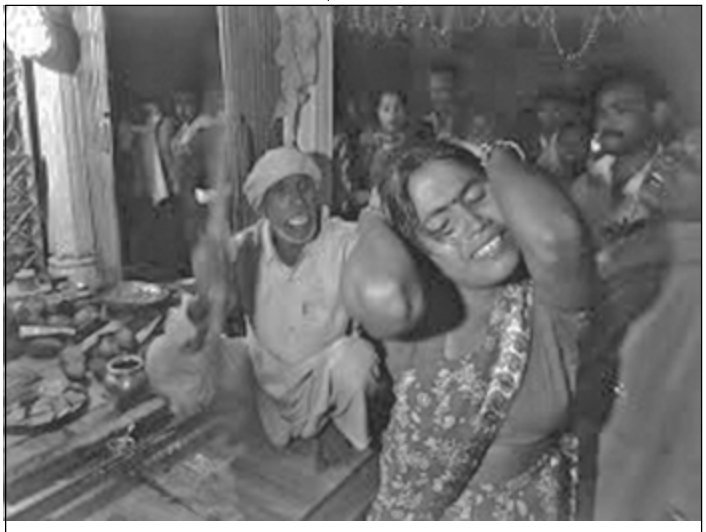

যখন শোভারাণী মাথা ঝাঁকিয়ে দু'হাত সাপের ফণার মতো তুলে গা দোলাতে থাকে তখন মায়ারাণী 'জয় মা মনসা' বলে চেঁচিয়ে ওঠেন।

অবশেষে মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত। শোভারাণিকে লালপাড়ের সাদা শাড়ি পরে হাতে প্রদীপ জ্বালিয়ে নিয়ে মন্দিরের দিকে এগোতে দেখে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা লোকজন সমবেত হল মন্দিরের দালানে। বেশি অপেক্ষা করতে হল না। অব্রাহ্মণ শোভারাণির পূজোতে মন্ত্রোচ্চারণের ঘটা নেই। ছবি ও নুড়ি পাথরে তেল-সিঁদুর লাগিয়ে ধূপধুনোর ধোঁয়া দিয়ে আরতি করার মধ্যেই গা ঝাঁকিয়ে মাথা দুলিয়ে চুল এলোমেলো করে ঘন ঘন ও জোরে জোরে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিতে থাকল। পাশে ফুল বেলপাতা গঙ্গাজল নিয়ে বসে থাকা মায়ারাণি ঘোষণা করল— মা এসেছে, মা এসেছে, কেউ ছোঁবে না মাকে। এবার মন্দির গেটে বসা পরিতোষের দায়িত্ব বেড়ে গেল। টিকিট নম্বর দেখে ভেতরে ঢোকাতে লাগল মানুষদের। একে একে ভেতরে ঢুকছে। মায়ের কাছে সমস্যার কথা বলছে। শোভারাণি তখন এলোচুলে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে সমাধানের কথা বলছে, তবে অল্প কথায়। বাকিটা দিদি মায়ারাণি বলে বুঝিয়ে সম্পূর্ণ করছে। তারপর মন্ত্রপূত ফুল, বেলপাতা, মাটি, শেকড়, গঙ্গাজল অথবা কালুর দোকান থেকে আনা লালসুতো, তেল, তিল বা সরষে প্রভৃতি মন্ত্রপূত করে নিয়ে মাখা, খাওয়া বা ধারণ করার নিয়ম বুঝিয়ে দিচ্ছে। বিনিময়ে আরও কিছু টাকা প্রতিদান হিসাবে জমা হচ্ছে সামনে রাখা বড় কাঁসার থালায়। আবার ভক্ত যদি খুব আকুল হয় তবে যে মাকে ছোঁয়া বারণ সেই মা ওরফে শোভারাণি নিজেই ছোঁয়া দিচ্ছে। ভক্তের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

যখন শোভারাণি মাথা ঝাঁকিয়ে দু'হাত সাপের ফণার মতো তুলে গা দোলাতে থাকে তখন মায়ারাণি 'জয় মা মনসা' বলে চেঁচিয়ে ওঠে। ভক্তরাও জয়ধ্বনি দেয় এবং বুঝে যায় যে শোভারাণির দেহে এখন মা মনসার আবির্ভাব হয়েছে। আবার এলোচুলে যখন জিভ বের করে রক্ত পান করার কথা বলে, তখন মা কালী বলে আর সন্দেহ থাকে না। লোকে মানত করে, আবার মাঝে মাঝে কেউ কেউ মানত পূর্ণ হয়েছে বলে বাতাসা থেকে পাঁঠা এমন কী সোনার গয়না পর্যন্ত উৎসর্গ করে মায়ের নামে।

অবশ্য এই জিন ভাল জিন। কেবল মূর্তি থাকা না থাকার বিষয়টাই দেবদেবীর সঙ্গে জিন বা পীরের ভরের পার্থক্য।

এখানে যে ভরের বর্ণনা দেওয়া হলো, তা কিন্তু আর সাধারণ ভর নয়। অসাধারণ এই ভরের পিছনে আর ভূত-টুত নয়, থাকে সাক্ষাৎ দেবদেবী। মুসলিম পরিবারে এই রকম ভর হলে তা জিন কিংবা পীরের ভর বলে পরিচিতি পায়। অবশ্য এই জিন ভাল জিন। কেবল মূর্তি থাকা না থাকার বিষয়টাই দেবদেবীর সঙ্গে জিন বা পীরের ভরের পার্থক্য। এই রকম ভরের বৈশিষ্ট্য হল —

১। সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনেই ভর হয়ে থাকে : কালী, মনসা বা শীতলা হলে সাধারণত মঙ্গল ও শনিবার, সন্তোষীর ভর শুক্রবার, মহাদেবের সোমবার আবার জিন বা পীরের ভর সাধারণত শুক্রবার হয়ে থাকে। তবে রবিবারেও ভর হতে দেখা গেছে, হয়ত ছুটির দিন বলে।

২। দিনের নির্দিষ্ট সময়েই ভর শুরু হয়ে থাকে : দূর-দূরান্ত থেকে লোকের আসা-যাওয়ার জন্য যাতে সময় পাওয়া যায়, সে জন্য প্রধানত দুপুরের সময়েই ভর হতে দেখা যায়। অবশ্য এমন ঘটনাও আছে যে রাত বারোটায় অন্ধকার ঘরে পীর এসে ভরের মাধ্যমে অপারেশন করে দিয়ে যাবে— এই কারণে সন্ধ্যা থেকে লোকজন এসে হাজির হয়ে অপেক্ষা করছে।

৩। ভরের প্রধান উদ্দেশ্য রোগ নিরাময় : ভরে এসে সমাধান হবে না এমন কোনও সমস্যা থাকতেই পারে না বলে এরা দাবি করে। তবে রোগ সারানোটা প্রধান। আর সারাতে পারে না এমন রোগ তালিকাতে নেই। জ্বর-জ্বালা থেকে শুরু করে ক্যানসার কিংবা এডস সারানো এদের কাছে জলভাত।

৪। উপকার পেতে টাকাপয়সা লাগে : চোখকান খোলা রাখলেই দেখা মেলে ইনকামের বহরটা। সরাসরি লেনদেন চোখে দেখা না গেলেও, ধর্মবিশ্বাসকে হাতিয়ার করে প্রচুর অর্থ আত্মসাৎ করা হয়। পুজো-পাঠ, যাগ-যজ্ঞ, ঘরবন্ধ, বাস্তুবন্ধ, প্রভৃতি আচার অনুষ্ঠান পালনের অজুহাতে অথবা আংটি, পাথর, তাবিজ, কবচ, মাদুলি বা শেকড় বাকড়ের বিনিময়ে প্রচুর টাকার লেনদেন হয়।

৫। দেবতার মন্দির বা পীরের দরগায় ভর হয় : যদিও অনেক ক্ষেত্রে নিজের বাড়িটাকেই ব্যবহার করা হয়।

দেবতার এবং পীরের বেশিরভাগ ভরই সুচতুর অভিনয়ের দ্বারা সম্পন্ন হয়। তবে মাঝে মধ্যে অন্য রকমও হতে পারে। ভূতের ভরের ক্ষেত্রে আমরা জেনেছি যে সেটা ছিল অশুভ শক্তির ভর। অশুভ শক্তিকে তাড়ানোর কথা মানুষ ভাবতে পারে। কিন্তু দেবদেবীর ওপর অন্ধভক্তি ও বিশ্বাসের কারণে কেউ মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে অস্বাভাবিক আচরণ করলে স্বার্থান্বেষী মানুষরা তাকে শুভ শক্তির ভর হিসাবে লালনপালন করেন, তাড়াতে দেন না। ধর্মভীরু মানুষরা তো তাকে তাড়ানোর কথা ভাবতেও পারে না। একজন মানসিক রোগী এইভাবে পরিবারের উপার্জনের হাতিয়ার হয়ে পড়েন। অবশ্য এদের সবাই মানসিক রোগী নন, কেউ কেউ ভাল অভিনেতা।

এই ধরনের ভরে গিয়ে যারা উপকার পেয়েছে বলে দাবি করে তারা এতটাই পরনির্ভর যে ভরের নির্দেশকেই সমাধান বলে মনে করে। ধরুন, পণ দিতে না পারায় যিনি মেয়ের বিয়ে দিতে পারছেন না, তিনি ভরে গিয়ে জানলেন এক বছরের মধ্যে মেয়ের বিয়ে হবে। এবার তিনি কী করবেন? তিনি কি বিয়ে নিশ্চিত বুঝে পাত্র দেখা বন্ধ রাখবেন? অবশ্যই না। বরং তিনি পাত্রের অনুসন্ধানকে আরও জোরদার করবেন। এই প্রচেষ্টায় তিনি বিফল হলে অর্থাৎ এক বছরের মধ্যে মেয়ের বিয়ে না হলে ভাগ্যের দোষ বা নিজের কোনও কৃতকর্মের ফল বলে চুপ করে থাকবেন। অন্তত ভরের সমালোচনা তিনি কখনোই করবেন না। এই কারণে ভরের কথামতো গিয়ে কারও কাজ হয়নি বা ক্ষতি হয়েছে—এই রকম কথা সাধারণত শোনা যায় না। আর যদি এক বছরের মধ্যে মেয়ের বিয়ে হয়ে যায় তবে তাকে দেবতা বা পীরের অনুগ্রহ মনে করে পাড়া প্রতিবেশিকে জানান দিয়ে বিশেষ পূজো, দান কিংবা মানত থাকলে তা পূরণের ব্যবস্থা করে থাকেন। এইভাবে মানুষের প্রচেষ্টার ফসল শেষ পর্যন্ত দেবতা বা পীরের গোলায় ওঠে এবং তার পুরোটাই মন্দিরের বা দরগার সেবাইতের ভোগে লাগে।

আবার রোগ সারানোর প্রশ্নে অনেকেই এই ধরনের ভরকে দেবতা বা পীরের মহিমার উদাহরণ বলেই মনে করেন। প্রশ্ন উঠতে পারে যাঁরা নিজের সম্পর্কে রোগ সারানোর দাবি করছেন তাঁরা কি মিথ্যা বলছেন? এর উত্তর হ্যাঁ বা না দু'টোই হতে পারে। এভাবে রোগ সারানোর প্রসঙ্গে তিন রকম ঘটনা ঘটতে পারে।

এক: তিনি নিপাট মিথ্যা কথা বলছেন। ভক্তির আতিশয্যে বা নিজেকে প্রচারের আলোয় আনার প্রচেষ্টায় মিথ্যা বলছেন, এছাড়া ভরে পড়া ব্যক্তির সঙ্গে তার গোপন আঁতাতও থাকতে পারে।

দুই : সাময়িক কষ্ট সত্যিই ছিল। ভরে পড়া ব্যক্তি সেই সাময়িক কষ্টকেই বেশ বড় রোগ বলে অভিহিত করলেন। তারপর রোগ সারিয়ে দেওয়ার নামে তেল মেখে কিংবা মাটি খেয়ে কিছু দিন কাটলে রোগ যখন নিজে থেকে সেরে গেল সেটাই প্রচারের গুণে ভরের মহিমা হয়ে দাঁড়ায়।

তিন : সত্যিই রোগের কষ্ট ছিল। ভরে গিয়ে তা দূর হয়েছে।

সত্যিই যদি ভরে গিয়ে কারও রোগ সেরে গেছে বলে দাবি করেন, তা হলে প্রশ্ন করতে হবে যে, একই সঙ্গে ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে চলছিলেন কি না? যদিও এ সব প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া মুশকিল। তবুও খোঁজ নিলে দেখা যাবে অধিকাংশ মানুষই দু' পথের চলার নীতি নিয়ে থাকে। মুসলমান সমাজে একটা বিশ্বাস রয়েছে, যে দাওয়া এবং দোয়া দুই-ই না কি দরকার। এখানে দাওয়া-র অর্থ ওষুধ এবং দোয়া হল কারও অনুগ্রহ। এবং সাধারণ বিশ্বাসে ভর হল দেবতা বা পীরের অনুগ্রহের উপায়। সুতরাং এই সব ক্ষেত্রে রোগ ভাল হওয়ার কারণ অজানাই থাকে। কিন্তু সাধারণ মানুষ সেটাকে দেবতা বা পীরের অনুগ্রহেই ভাল হয়েছে বলে মনে করে। চিকিৎসাবিজ্ঞানে রোগ সেরে যাওয়ার নানাবিধ কারণের উল্লেখ রয়েছে। পরিবেশ, পরিস্থিতি, সময় ইত্যাদির সাপেক্ষে রোগের বাড়ে-কমে। ওষুধ দিয়ে রোগ সারানোর ক্ষেত্রেও মনে রাখা দরকার যে— সঠিক ওষুধে যেমন রোগ সারে তেমনি ভুল ওষুধে এমনকী, বিনা ওষুধেও রোগ সারতে পারে। চিকিৎসা বিজ্ঞানে 'প্লাসিবো' নামে এক পদ্ধতির কথা বলা হয়। যেখানে চিকিৎসার মূল্যহীন ট্যাবলেট, ক্যাপসুল ব্যবহার করেও রোগ নিরাময় করা সম্ভব। চিকিৎসার এই পদ্ধতিতে রোগীর বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়েই রোগ সারানো হয়। ভরের মাধ্যমে পাওয়া সমাধান সূত্রকে বিশ্বাসী মানুষ নিয়ম মেনে পালন, ধারণ ইত্যাদি করেন, তা সে বাস্তবে যতই মূল্যহীন হোক না কেন। ফুল, বেলপাতা, মাটি প্রভৃতির ব্যবহারে বা

অধিকাংশ মানুষই দু' পথের চলার নীতি নিয়ে থাকে। মুসলমান সমাজে একটা বিশ্বাস রয়েছে যে দাওয়া এবং দোয়া দুই-ই না কি দরকার।

তিনি কি বিয়ে নিশ্চিত বুঝে পাত্র দেখা বন্ধ রাখবেন? অবশ্যই না। বরং তিনি পাত্রের অনুসন্ধানকে আরও জোরদার করবেন।

তাবিজ, কবচ বেঁধে রোগী যে প্রশান্তি অনুভব করেন, তার দরুনও রোগ সত্যিই সেরে যেতে পারে। কিন্তু কোনও মারাত্মক রোগ যদি এভাবে সারানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়, তাতে রোগ জটিলতা বেড়ে গিয়ে প্রাণসংশয় হওয়াও বিচিত্র নয়। রোগের চিকিৎসায় যেহেতু রোগ নির্ণয় হওয়াটাই প্রধান বিবেচ্য, সেজন্য ওঝা গুণিন অপেক্ষা ডাক্তারই উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে পারেন একথা বলাই বাহুল্য।

দেবতা বা পীরের ভর প্রায়শই পুরোপুরি সাজানো ঘটনা। ঈশ্বরের নামে সুচতুর অভিনয়ের মাধ্যমে যে ভর বেশি মানুষের মন জয় করতে পারে সেই ভর তত বিখ্যাত হয়। যদিও কোথাও কোথাও মানসিক রোগীকে ব্যবহার করে লাভের কড়ি গুছিয়ে নেওয়ার ঘটনাও ঘটে। কেউ কেউ ভরে গিয়ে জানতে পারেন তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য কাউকে না জানানো সত্ত্বেও ভরে পড়া ব্যক্তি আগাম বলে দিচ্ছে। শুধু তিনি নন, আশপাশের লোকজনও এই ঘটনায় হতবাক হয়ে যান। কিন্তু জেনে রাখুন এটা কোনও ঈশ্বরের মহিমায় ঘটে না। চালাকির দ্বারাই এই মহৎ কাজটা সম্পন্ন করা হয়। ভরে পড়া ব্যক্তির সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হয়নি বটে কিন্তু খেয়াল করলেই বুঝবেন ভক্ত সেজে বা বন্ধু সেজে গল্পের ছলে আপনার আগমনের উদ্দেশ্য জেনে নিয়ে তথ্য পাচার করেছে কেউ। অনেক সময় আন্দাজে কিছু কথা বললেও তা যদি মিলে যায় তাতেও বাজিমাত হয়। আবার উপস্থিত দশজনের মধ্যে কোনও এক জনের কথাও যদি মিলে যায়, তবে বাকিদের সেই দেবতা বা পীরের ক্ষমতা নিয়ে আর সন্দেহ থাকে না।

যদি ওই সমস্ত ভরে-পড়া ব্যক্তিদের জীবনযাপনের দিকে ভাল করে পর্যবেক্ষণ করা যায় তবে দেখা যাবে— যে সমস্ত রোগ সারাতে ফুল বেলপাতা মাদুলি ওই ব্যক্তি অপরকে দিয়ে থাকেন— নিজের বা পরিবারের কারও রোগ সারাতে কিন্তু তার প্রয়োগ করেন না। যদিও লোক দেখানো আংটি, তাবিজ, কবচ, মাদুলি এঁরা ধারণ করে থাকেন। রোগ সারাতে এঁরা প্রয়োজনে ডাক্তার দেখান, ওষুধও খান। এঁরা নিজের ছেলের চাকরি নিশ্চিত করতে ঈশ্বরকে ভরসা না করে মানুষকে ঘুষ দিয়ে কাজ হাসিল করেন। নিজের মেয়ের বিয়ের ক্ষেত্রে ভাগ্যের ওপর নির্ভর না করে ঘটক, পণ প্রভৃতি সমাজ চলতি বিষয়ের ওপর নির্ভর করেন। দেবতা বা পীর নয়, মানুষই ওঁদের বিপদ-আপদের থেকে বাঁচান।

প্রশ্ন উঠতে পারে— চোখের সামনে ঠগবাজির এত উদাহরণ থাকা সত্ত্বেও মানুষ সেখানে কেন যান? এর প্রধান কারণ, আমাদের দেশে বিজ্ঞান-সম্মত চিকিৎসার সুযোগ নেওয়ার সামর্থ্য অধিকাংশ মানুষের নেই। থাকলেও তা সবার কাছে সহজলভ্য নয়। কারণ, তা শহরকেন্দ্রিক। আর সরকারি হাসপাতালের অবহেলা মানুষের কাছে অপরিচিত ঘটনা নয়। বাঁচার আশায় মানুষ তাই খড়কুটোকেই আশ্রয় করে। ধর্ম বিশ্বাসের মোহে ভরের মাধ্যমেই সমাধান খোঁজে। এ ছাড়া, কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের কারণেও মানুষ ভরের আশ্রয় নিয়ে থাকে। দুঃখ-কষ্ট-অভাব-বঞ্চনার কারণে এই যে দৈব বিশ্বাস তার মূলে তাই আঘাত করা খুব জরুরি।

জানা দরকার যে এই খারাপ অবস্থার জন্য ভাগ্য-নসীব, গ্রহ-নক্ষত্র বা কোনও ঈশ্বর দায়ী নয়। দায়ী হল এই অসাম্যের সমাজ ব্যবস্থা। এই সরল সত্যটাকে ভুলিয়ে রাখার জন্য দেখা যায় ধর্মকে, ধর্মীয় তাণ্ডবকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়।

দুঃখের কথা হল সমাজের কেষ্ট-বিষ্টুগণ বা সুবিধাভোগী মানুষরাই এই প্রশ্রয় দিয়ে থাকে। মানুষ যদি পাপ-পুণ্য, ঈশ্বর-আত্মার ভিতরেই তার অভাব-বঞ্চনার কারণ খোঁজে, তবে শাসক ও শোষক শ্রেণির লাভ। মানুষ তখন অধিকারের কথা বলবে না। ভাগ্যে যা আছে তাই মানতে বাধ্য হবে। শাসক ও শোষকগণ তখন বিনা বাধায় নিজের আখের গোছাতে পারবে। দুনিয়া জুড়ে তাই দেখা যাচ্ছে দুর্নীতি, স্বজনপোষণ প্রভৃতির মাধ্যমে এক শ্রেণি ভোগের শীর্ষে উঠে যাচ্ছে, অন্যদিকে, গরিবের ওপর নেমে আসছে অত্যাচার, অবহেলা। ঠিক এই কারণেই ঝাঁ চকচকে মন্দির, মসজিদ, গির্জা, গুরুদ্বারার পাশেই গরিবের কুঁড়েঘর দেখতে পাওয়া যায়।

প্রয়োজন তাই অসাম্যের এই সমাজব্যবস্থাকে পালটানোর। তৈরি হোক অধিকারবোধ। সব মানুষের বেঁচে থাকার মতো সুস্থ পরিবেশ একান্ত প্রয়োজন। খাদ্য-বস্ত্র -বাসস্থান -শিক্ষা-স্বাস্থ্য-চিকিৎসা যেন সকলের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে। বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদকে হাতিয়ার করে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষরাই ধ্বংস করবে এই জীর্ণ অসম ব্যবস্থা, এই প্রত্যাশা রইলো। তবেই গড়ে উঠবে নতুন সাম্যের সমাজ।

আপনাকে ছাড়া এ কাজ কি সম্ভব?

লেখক পরিচিতি : অলকেশ মণ্ডল, যুক্তিবাদী আন্দোলনের কর্মী এবং জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত।

এবোলা জ্বর

পশ্চিমবঙ্গে মানুষ যখন প্রাণ হারাচ্ছেন জাপানি এনকেফালাইটিসে, তখন পশ্চিম আফ্রিকা আক্রান্ত এবোলা হেমারেজিক ফিভারে। ছাড় পাচ্ছেন না ডাক্তার-স্বাস্থ্যকর্মীরাও। রোগটার ভয়াবহতা এবোলা জ্বরকে বিশ্বজোড়া সংবাদের শিরোনামে নিয়ে এসেছে। স্বাস্থ্যের বৃত্তে-র পাঠক-পাঠিকাদের কৌতূহল মেটাতে রোগটা নিয়ে জানাচ্ছেন — পত্রিকার সম্পাদকীয় দল।

এবোলা জ্বর এক রকমের ভাইরাস-ঘটিত রোগ, মানুষ ছাড়াও যাতে আক্রান্ত হতে পারে বাঁদর, গরিলারা।

এবোলা ভাইরাস যে পরিবারের তাদের বলা হয় ফাইলোভাইরিডি (Filoviridae)। এখন অবধি বিজ্ঞানীরা ৫ রকমের এবোলা ভাইরাস খুঁজে পেয়েছেন, তাদের মধ্যে ৪ রকম মানুষে রোগ সৃষ্টি করে—এবোলা-সুদান ভাইরাস, এবোলা-জাইর ভাইরাস, এবোলা আইভরি কোস্ট ভাইরাস, এবোলা বুন্ডিবুগিও। এত দিন আফ্রিকা মহাদেশের কিছু অংশে এই রোগ সীমাবদ্ধ ছিল। এখন এক ধরনের এবোলা-ভাইরাস ফিলিপিন্সে পাওয়া গেছে।

রোগাক্রান্ত পশু বা পশুর দেহাংশ, দেহজ পদার্থ থেকে মানুষে রোগ ছড়াতে পারে। অসুস্থ মানুষের দেহরস থেকে সুস্থ মানুষে রোগ-জীবাণু ছড়াতে পারে। হাসপাতালে সংক্রামিত সূচ দিয়েও রোগ ছড়ায়।

রোগের উপসর্গ : শরীরে ভাইরাস ঢোকার পর পুরোপুরি রোগ-লক্ষণ দেখা দিতে মোটামুটি এক সপ্তাহ সময় লাগে। এই সময়টায় গাঁটে ব্যথা-ফোলা, কোমরে ব্যথা, কাঁপুনি দিয়ে ঠান্ডা লাগা, পাতলা পায়খানা, ক্লান্তি, জ্বর, মাথাব্যথা, গা ম্যাজম্যাজ করা, বমিভাব, গলাব্যথা,বমি, ইত্যাদি হতে পারে।

পরে দেখা দেয় বিপজ্জনক রোগ-লক্ষণ :

- চোখ, কান, নাক থেকে রক্তক্ষরণ
- মুখ দিয়ে বা পায়ু থেকে রক্তপাত
- চোখে কনজাংটিভাইটিস
- মহিলাদের যোনিদ্বারে ও পুরুষদের অণ্ডকোষে ফোলা
- চামড়ায় ব্যথাভাব
- চামড়ার নীচে রক্তক্ষরণ হয়ে সারা শরীরে লাল-লাল ফুসকুড়ি
- মুখের তালু লাল হয়ে যাওয়া
- শক
- অচেতনতা (কোমা)
- শরীরের রক্তনালীগুলোতে রক্ত জমাট বাঁধা।

এবোলা জ্বরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা : রক্তের পুরো গণনা (Complete Blood Count), রক্তে ইলেকট্রোলাইট মাপা, রক্ত জমাট বাঁধার পরীক্ষা, লিভারের কর্মক্ষমতা পরীক্ষা (Liver Function Test) করা হয় রোগী কেমন আছেন বোঝার জন্য। রোগ-নির্ণয়ে নিশ্চিত হতে রোগীর শরীরে এবোলা ভাইরাসের বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি আছে কি না পরীক্ষা করে দেখা হয়।

এবোলা জ্বরের চিকিৎসা : এখনও অবধি এমন কোনও ওষুধ আবিষ্কৃত হয়নি যা দিয়ে এবোলা ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করা যায়। এবোলা জ্বরের রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করে নিবিড় চিকিৎসা (intensive care) করতে হয়। শক সামলাতে শিরা দিয়ে ওষুধ ও তরল দেওয়া হয়। রক্ত ক্ষরণ হতে থাকলে টাটকা রক্ত বা প্লেটলেট দেওয়া হয়।

রোগী সারবেন তো?

খুবই দুঃখের বিষয় যে, এবোলা জ্বরের আক্রান্তদের প্রায় ৯০% মারা যান। রক্তক্ষরণে যত না মারা যান, তার চেয়ে বেশি মারা যান রক্তচাপ কমে গিয়ে। যাঁরা বেঁচে যান তাঁদের কারও কারও চুল উঠে যায়, কারও অনুভূতির সমস্যা হয়।

রোগ ঠেকাতে :

- যে অঞ্চলে এবোলা জ্বরের মহামারী চলছে, সে জায়গা এড়িয়ে চলুন।
- রোগীদের কাছে যেতে হলে পুরো শরীর ঢাকা গাউন, গ্লাভস, মুখোশ পরলে সংক্রামিত হওয়ার ঝুঁকি অনেকটা কমে।

ধর্ম-জাতপাত-অযুক্তি-কর্তৃত্ব ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আপনার যুক্তিবাদী মননচর্চার দীর্ঘদিনের সাথী

একুশ শতকের যুক্তিবাদী

একুশ শতকের যুক্তিবাদী

ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির কেন্দ্রীয় মুখপত্র

৩১, প্রাণকৃষ্ণ সাহা লেন, বরানগর, কলকাতা - ৭০০ ০৩৬

যোগাযোগ : ৯৮৩৬৪৭৭১৯৫, ৯৮৩০৬৭৩৫১২

এছাড়া কমবয়সীদের জন্য আছে আকর্ষণীয় গল্প-ফিচার-ছবিতে ঠাসা কিশোর যুক্তিবাদী

জাপানি এনকেফালাইটিস

কোনও বছর ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া কোনও বছর বার্ড ফ্লু। এ বছর যে মারণরোগ ছোবল বসাচ্ছে তার নাম—জাপানি এনকেফালাইটিস। দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগে স্থানান্তর করা হয়েছে ক'জন প্রশাসক চিকিৎসককে, লোকালয় থেকে শুয়োর হটানোর অভিযান শুরু হয়েছে। মশা যাতে শুয়োরকে কামড়ে মানুষকে কামড়াতে না পারে, তাই শুয়োরদের মশারির মধ্যে রেখে নজরদারির সিসিটিভি লাগানোর ভাবনা চলছে। কী এই রোগ, কতটা বিপজ্জনক, ঠেকানোর উপায়ই বা কী— লিখছেন **'স্বাস্থ্যের বৃত্তে'-র সম্পাদকীয় দল।**

জাপানি এনকেফালাইটিস রোগটা কী?

এক ধরনের ভাইরাস-ঘটিত গুরুতর ছোঁয়াচে রোগ জাপানি এনকেফালাইটিস। এই ভাইরাস থাকে শুয়োর ও পাখিদের শরীরে। এশিয়ার গ্রামাঞ্চলে বেশি দেখা যায়, কেন না সেখানে শুয়োর পালন করা হয় আর শস্যক্ষেতে পাখিরা থাকে। এক রোগী থেকে অন্য সুস্থ মানুষে এ ভাইরাস সরাসরি ছড়াতে পারে না। সংক্রামিত মশার কামড়েই এক জনের রোগ হতে পারে। মশার কামড়ে শরীরে জাপানি এনকেফালাইটিসের জীবাণু ঢুকলেই রোগ হবে এমনটা নয়, বেশির ভাগ মানুষের কোনও উপসর্গ থাকে না। কারও কারও জ্বর-মাথাব্যথা থাকে, কিছু জনের গুরুতর মস্তিষ্কের সংক্রমণ হয়।

জাপানি এনকেফালাইটিসে আক্রান্ত ৪ জন মানুষের মধ্যে ১ জন এ রোগে মারা যান।

জাপানি এনকেফালাইটিসের উপসর্গ

- জ্বর
- ঘাড় শক্ত হয়ে যাওয়া
- খিঁচুনি
- চেতনায় বিঘ্ন
- কথা বলতে না পারা
- পক্ষাঘাত
- অচেতনতা — কোমা

রোগটা কতটা মারাত্মক?

জাপানি এনকেফালাইটিসে আক্রান্ত ৪ জন মানুষের মধ্যে ১ জন এ রোগে মারা যান। যাঁরা মারা যান না, তাঁদের প্রায় অর্ধেকের মস্তিষ্কে স্থায়ী ক্ষতি হয়ে যায়। এশিয়ায় প্রতি বছর ৫০ হাজার মানুষ জাপানি এনকেফালাইটিসে আক্রান্তহন, মারা যান প্রায় ১৫ হাজার জন, বাকিদের প্রায় ৭৫%-এর রোগের কারণে স্থায়ী বিকলাঙ্গতা থেকে যায়। গর্ভবতী মায়ের এ রোগ হলে গর্ভস্থ শিশুরও ক্ষতি হতে পারে।

এখনও অবধি এমন কোনও ওষুধ বেরোয়নি যা দিয়ে এ রোগের ভাইরাসকে মেরে ফেলা যায়।

জাপানি এনকেফালাইটিসের চিকিৎসা

এখনও অবধি এমন কোনও ওষুধ বেরোয়নি, যা দিয়ে এ রোগের ভাইরাসকে মেরে ফেলা যায়। হাসপাতালে ভর্তি করে এনকেফালাইটিস রোগীকে স্যালাইন ও অক্সিজেন দেওয়া হয়, তাঁর উপসর্গগুলোকে কমানোর জন্য প্রয়োজন মতো ওষুধ দেওয়া হয়।

কী ভাবে জাপানি এনকেফালাইটিস ঠেকানো যায়?

এ রোগ ঠেকাতে মশার কামড় এড়াতে হবে—

- এমন জামাকাপড় পড়ুন যাতে শরীরের বেশির ভাগটা ঢাকা থাকে।
- যদি সম্ভব হয় তা হলে এমন জায়গায় থাকা বা কাজ করা যেখানে জানলা-দরজায় মশা আটকানোর জন্য জাল লাগানো আছে।
- মশা তাড়ানোর জন্য রাসায়নিক ব্যবহার করা।
- মশারি ব্যবহার করা।

জাপানি এনকেফালাইটিসের টিকা

আমেরিকায় যে টিকা ব্যবহার করা হয় তা ১৭ বছর বা তার বেশি বয়সীদের জন্য। ২৮ দিন ছাড়া দুটো টিকা লাগানো হয়। যাঁরা জাপানি এনকেফালাইটিস-সঙ্কুল এলাকায় যাচ্ছেন তাঁদের দ্বিতীয় টিকাটা যেন যাওয়ার অন্তত এক সপ্তাহ আগে লাগানো হয়।

যাঁদের টিকা লাগানোর পর এক বছর পেরিয়ে গেছে, তাঁদের সংক্রমণের ঝুঁকি থাকলে আরেকটা বুস্টার ডোজ লাগানো হয়।

অন্য টিকার সঙ্গে এক সঙ্গে এই টিকা দেওয়া যায়।

ভারত সরকারের জাপানি এনকেফালাইটিসে টিকা সংক্রান্ত নির্দেশিকা থেকে

- এই টিকা তৈরি করে কসৌলির সেন্ট্রাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট।
- ইঁদুরের মস্তিষ্কে চাষ করা ভাইরাসকে মেরে বানানো এই টিকার তিনটে ডোজ লাগে। প্রথম দুটো ডোজ দেওয়া হয় চামড়ার নিচে ৭-১৪ দিন ছাড়া। দ্বিতীয় ডোজের ১ মাস থেকে ১ বছরের মধ্যে তৃতীয় ডোজ। তিন বছর পরে একটা বুস্টার ডোজ লাগে।
- ইঁদুরের মস্তিষ্কে থেকে টিকা তৈরির এই প্রযুক্তির সমস্যা হল— কয়েক লক্ষ ডোজের বেশি টিকা এক সঙ্গে উৎপাদন করা যায় না।
- মহামারীর সময় টিকা লাগিয়ে লাভ নেই। কেননা, দ্বিতীয় ডোজ লাগানোর অন্তত এক মাস পর প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হয়।

কাদের জাপানি এনকেফালাইটিস টিকা লাগানো যাবে না?

- কারও যদি আগে এই টিকা লাগিয়ে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকে, তা হলে এই টিকা লাগানো যাবে না।
- কারও ভয়ঙ্কর ধরনের অ্যালার্জির ইতিহাস থাকলেও এই টিকা লাগানোর আগে ডাক্তার বিচার-বিবেচনা করবেন।
- সাধারণত গর্ভবতী মহিলাদের জাপানি এনকেফালাইটিসের টিকা লাগানো হয় না।

টিকা থেকে বিপদ

যে কোনও ওষুধ থেকে যেমন বিপদ হতে পারে, তেমনই হতে পারে জাপানি এনকেফালাইটিসের টিকা থেকে। তবে সে সম্ভাবনা খুবই কম।

অল্প-স্বল্প সমস্যার মধ্যে আছে :

- যেখানে টিকার ইঞ্জেকশন লাগানো হয়েছে, সেখানে এমনিতে ব্যথা বা টিপলে ব্যথা। এমনটা দেখা যায় ৪ জনের মধ্যে মোটামুটি ১ জনের।
- ২০ জনের মধ্যে প্রায় ১ জনের ইঞ্জেকশনের জায়গায় ফোলা বা লালভাব হয়।
- ৫ জনের মধ্যে ১ জনের মাথায় বা মাংসপেশিতে ব্যথা হয়।

মাঝারি রকম বা বেশি সমস্যা হল :

- খুব অল্প কিছু মানুষের টিকায় তীব্র প্রতিক্রিয়া হতে পারে। তাই অন্য সব টিকার মতো এই টিকার ওপরও নজরদারি চালানো হচ্ছে।
- তীব্র প্রতিক্রিয়া হলে খুব বেশি জ্বর বা আচার-আচরণে পরিবর্তনের মতো অস্বাভাবিকত্ব দেখা যেতে পারে। শ্বাসকষ্ট, গলা ভেঙে যাওয়া, সাঁই-সাঁই আওয়াজ হতে পারে। গায়ে আমবাত দেখা দিতে পারে। রোগী ফ্যাকাসে হয়ে যেতে পারেন। দুর্বল লাগতে পারে। নাড়ীর গতি বেড়ে যেতে পারে। ঝিমুনি আসতে পারে।
- এমনটা হলে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারি সহায়তা চাই।

সূত্র :

১. ইউএস ন্যাশনাল লাইব্রেরি অফ মেডিসিন ও ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হেলথ-এর পরিষেবা MedlinePlus। ২. আইসিএমআর ৩. এনএইচএস চয়েস।

চেনা ওষুধ অচেনা কথা

অ্যালপ্রাজোলাম

একটু ওষুধ নিয়ে চর্চা করেন যাঁরা তাঁদের কাছে অ্যালপ্রাজোলাম খুব চেনা ওষুধ, যদিও তাঁরা অন্য নামে চেনেন। সাধারণভাবে ঘুমের ওষুধ বলতে জোলাম, অ্যালজোলাম এই সব কোম্পানির দেওয়া নামে অ্যালপ্রাজোলাম পাওয়া যায়। অ্যালপ্রাজোলাম বেনজোডায়াজেপিন নামক একটা গোষ্ঠীর অন্তর্গত ওষুধ।

কীভাবে শরীরে ক্রিয়া করে?

অ্যালপ্রাজোলাম খাওয়ার পরে প্রায় সবটাই পৌষ্টিকতন্ত্র দিয়ে শোষিত হয়। তারপরে রক্তে মিশে মস্তিষ্কে গিয়ে বেনজোডায়াজেপিন নামক এক রকম গ্রাহকের (Receptor) সঙ্গে যুক্ত হয়ে এর কাজ করে। মূলত লিভারে বিপাক ক্রিয়ার পরে মলমূত্রের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। সমস্ত প্রক্রিয়ায় যে পরিমাণ ওষুধ শরীরে ঢোকে তার অর্ধেক পরিমাণ শরীর থেকে বেরিয়ে যেতে যে সময় নেয়, তাকে বলা হয় ওষুধের হাফলাইফ। অ্যালপ্রাজোলামের ক্ষেত্রে এই হাফলাইফ হচ্ছে ১২ থেকে ১৫ ঘণ্টা।

কী কী কারণে ব্যবহার হয় :

উদ্বেগ রোগে, আতঙ্ক রোগে (Panic Disorder), এছাড়া অবসাদ রোগের সঙ্গে উদ্বেগ রোগ থাকলে অ্যালপ্রাজোলাম ব্যবহার হয়। তাছাড়া ঘুম না হলে, আই বি এস, সোমাটিক সিম্পটম এবং উল্লাস রোগে এবং অন্যান্য সাইকোটিক রোগে অন্য ওষুধের সহযোগী ওষুধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

গর্ভবতী এবং দুগ্ধদানকারী মা : গর্ভবতী এবং দুগ্ধদানকারী মায়েদের অ্যালপ্রাজোলাম খাওয়া উচিত নয়।

উদ্বেগ রোগে, আতঙ্ক রোগে (Panic Disorder), এছাড়া অবসাদ রোগের সঙ্গে উদ্বেগ রোগ থাকলে অ্যালপ্রাজোলাম ব্যবহার হয়।

ডোজ বা মাত্রা :

ওষুধটা সাধারণত 0.25mg, 0.5mg এবং 1mg মাত্রার ট্যাবলেট হিসাবে পাওয়া যায়। বিভিন্ন রোগে বিভিন্ন পরিমাণ ব্যবহৃত হয়। তবে সাধারণত দিনে দুই থেকে তিনবার দেওয়া হয় এবং সারাদিনে 4mg-র বেশি ব্যবহার করা হয় না। বয়স্ক মানুষ, লিভার বা কিডনির অসুখ থাকলে কম মাত্রায় সতর্কভাবে ব্যবহার করতে হবে।

গর্ভবতী এবং দুগ্ধদানকারী মা :

গর্ভবতী এবং দুগ্ধদানকারী মায়েদের অ্যালপ্রাজোলাম খাওয়া উচিত নয়। বাচ্চার মস্তিষ্কে ক্ষতি হতে পারে, দেহ শিথিল হয়ে যেতে পারে। এছাড়া বাচ্চার মৃগী রোগও হতে পারে।

ওষুধের পার্শ্বক্রিয়া :

জীবন সংশয় হয়, এরকম কোনও পার্শ্বক্রিয়া অ্যালপ্রাজোলামের নেই। সব থেকে বেশি যে পার্শ্বক্রিয়া দেখা যায় তা হচ্ছে মাথা টলমল করা, ঘুমঘুম ভাব এবং অবসন্নতা। এছাড়া মাথা যন্ত্রণা, দেখতে অসুবিধা হওয়া, কোষ্ঠ কাঠিন্য বা ডায়রিয়া হতে পারে। বমি ভাব, ওজন বাড়া, চামড়ার রোগও হতে পারে। অ্যালপ্রাজোলাম খাওয়া অনেক সময় নেশার মতো হয়ে যায়— শারীরিক বা মানসিক নির্ভরতা তৈরি হয়। ওষুধটা ঘুম পাড়াতে বা উত্তেজনা কমাতে সাহায্য করে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে পার্শ্বক্রিয়া হিসাবে উত্তেজনা বৃদ্ধি ও ঘটবে পারে।

লেখক পরিচিতি : ডা. সুমিত দাশ, এমবিবিএস, ডিপিএম, মনোরোগ বিশেষজ্ঞ।

মাইকোনাজোল ও ক্লোট্রাইমাজোল

ওষুধ দুটোকেই আপনারা চেনেন হয়তো, যদিও এই নামে চেনেন না। মাইকোনাজোল ও ক্লোট্রাইমাজোল হলো ওষুধ দুটোর জেনেরিক নাম, আর আপনারা চেনেন ক্যান্ডিড, জোল, বা সারফাজ ইত্যাদি কোম্পানির দেওয়া নামে, ব্র্যান্ডনামে। এরা 'ইমিডাজোল' গোত্রের লাগানোর ওষুধ।

কী ভাবে কাজ করে?

এরা ছত্রাক সংক্রমণে কাজ করে। ছত্রাকের কোষপ্রাচীর তৈরি হতে বাধা দেয়। এদের উপস্থিতিতে ছত্রাকের কোষপ্রাচীর ত্রুটিপূর্ণ ভাবে তৈরি হয়, আর ছত্রাক মারা যায়।

কোন কোন রোগে ব্যবহার হয়?

১. দাদ জাতীয় ছত্রাক সংক্রমণে; ২. হাজা; ৩. ছুলি; ৪. সেবোরিক ডার্মাটাইটিস (এক ধরনের একজিমা)।

> মনে রাখতে হবে, দাদ যে ছত্রাক দ্বারা সংক্রমণে হয়, সেই ছত্রাক নখ, মাথার ও দাড়িগোঁফের চুলের গোড়ায়, হাত ও পায়ের পাতার মোটা চামড়ায় আক্রমণ করতে পারে। সেখানে মাইকোনাজোল ও ক্লোট্রাইমাজোল তেমন কাজে দেয় না, মুখে খাবার অন্য ওষুধ খেতে হয়।

কেমন ভাবে প্রয়োগ করতে হয়?

মুখে খাওয়া বা ইঞ্জেকশন দেওয়া যায় না, স্থানীয়ভাবে লাগাতে হয়। তাই মাইকোনাজোল ২%, ও ক্লোট্রাইমাজোল ১% ক্রিম, লোশন, স্প্রে, ও পাউডার হিসেবে দেওয়া হয়। সাধারণত অসুখ সারাতে ক্রিম, লোশন, স্প্রে, ব্যবহার করা হয়, আর পাউডার (তুলনায় কম কাজের) সংক্রমণ আটকাতে দেওয়া হয়।

ক্রিম বা লোশন দিনে দুবার লাগাতে হয়। কোথায় কতটা অসুখ হয়েছে সেই অনুযায়ী ২ থেকে ৪ সপ্তাহ ওষুধ লাগাতে হয়; বা অন্যভাবে বলতে গেলে, রোগ লক্ষণ মিলিয়ে যাবার পরেও ১ সপ্তাহ ওষুধ লাগিয়ে যেতে হয়।

লাগানোর সময় দুটো কথা মনে রাখা জরুরি। প্রথমত, যেখানে অসুখ বা ছত্রাক সংক্রমণ আছে, তার ওপরে ও তার পাশে ২ সেন্টিমিটার পর্যন্ত এলাকায় ওষুধ লাগাতে হবে। দ্বিতীয়ত, চুলকানি কমে গেলেই সেখানে রোগ নেই ভেবে ওষুধ বন্ধ করে দেওয়া চলবে না।

বিশেষ স্থানে বিশেষ প্রয়োগ

মুখের ভেতরে লাগানোর জন্য বিশেষভাবে তৈরি 'মাউথ পেন্ট' দিতে হয়। সেটা মুখের ভেতরকার লালা মুছে লাগাতে হয়, তারপর কিছুক্ষণ মুখ হাঁ করে শ্বাস নিতে হয়, নইলে লালাতে ওষুধ ধুয়ে যায়।

মেয়েদের যোনির ভেতরে লাগানোর জন্য বিশেষ মলম আছে, আর আছে 'ভ্যাজাইন্যাল ট্যাবলেট', যেটা কিন্তু খাবার জন্য নয়; যোনির ভেতরে ঢুকিয়ে রেখে দিলে সেটা গলে গিয়ে স্থানীয়ভাবে কাজ করে।

গর্ভবতী মা : ওষুধ দুটোই 'প্রেগন্যান্সি ক্যাটেগরি C'। অর্থাৎ গর্ভাবস্থায় এগুলো কতটা নিরাপদ, তা প্রমাণিত হয়নি বটে, কিন্তু কোনও ক্ষতিও তেমন দেখা যায় নি।

বাচ্চা : বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এই ওষুধ দেওয়া যায়। কিন্তু ঠিক কত ছোট বাচ্চাদের দেওয়া যাবে সেটা নিয়ে তেমন গবেষণা নেই। কার্যক্ষেত্রে সব বয়সের বাচ্চাদের ত্বকে এটা দেওয়া হয়।

পার্শ্বক্রিয়া : তেমন নেই। বিরল ক্ষেত্রে চামড়ায় ইরিটেশন, অ্যালার্জিক কন্ট্যাক্ট ডার্মাটাটাইটিস, আমবাত হতে পারে, আর ঠিকঠাক প্রয়োগ না করার ফলে অন্য অসুবিধা হতে পারে। সেটা কী রকম? নিচে দেখুন।

জেনে রাখুন :

১. আমাদের দেশে কম্বিনেশন মলম খুব চলে। কম্বিনেশন মানে একাধিক ওষুধ মিশিয়ে একটাই মলম (বা বড়ি, কিন্তু এখানে মলমের কথাই বলব)। মাইকোনাজোল ২ শতাংশ বা ক্লোট্রাইমাজোল ১ শতাংশর সঙ্গে হয়তো লাগানোর স্টেরয়েড মিশিয়ে তৈরি হল একটা ওষুধ। সেটা কেবল মাইকোনাজোল বা কেবল ক্লোট্রাইমাজোলের চাইতে বেশি দামি, তাই ওষুধ বিক্রেতা বা প্রস্তুতকারী কোম্পানির লাভ বেশি। যদি ডাক্তারের কাছে না গিয়ে দোকানদারের কাছ থেকে বলে ওষুধ নেওয়া হয়, তা হলে তিনি অসুখ না জেনে ওষুধ দিচ্ছেন বলে পাঁচরকম মেশানো ওষুধই দিতে চাইবেন, কোনওটা না কোনওটা কাজে লেগে যাবে। অনেক সময় ডাক্তারও বুঝতে না পেরে কম্বিনেশন মলম লেখেন। ছত্রাক সংক্রমণের প্রথম দিকে, বা সেবোরিক ডার্মাটাটিস-এ, স্টেরয়েড মেশানো থাকলে কাজও ভাল হয়।

কিন্তু যথাযথ ক্ষেত্র ছাড়া বেশিদিন স্টেরয়েড-মেশানো মলম ব্যবহার করলে চামড়ার নানা ক্ষতি হয়। অনেক সময় সেই ক্ষতি কোনও দিনই পূরণ করা যায় না। বিশেষ করে মুখের ত্বকে এই ক্ষতি বীভৎস রূপ নিতে পারে। সুতরাং, সাবধান। কী মলম ব্যবহার করছেন সেটা জেনে বুঝে নিন। নিজে নিজে, প্রতিবেশির কথায় বা দোকানদারের আশ্বাসে ভুলে স্টেরয়েডযুক্ত মলম লাগাবেন না। ডাক্তার যেমন বলেছেন তার বেশিদিন মলম লাগাবেন না।

২. বি-টেক্স থেকে ঢোল কোম্পানির দাদের মলম, মাখন মলম থেকে ইলেকট্রিক লোশন, আমাদের দেশে দাদ-হাজার চিকিৎসায় এসব বহুদিন ধরে চলছে। এগুলো হল মূলত স্যালিসাইলিক অ্যাসিড আর ল্যাকটিক অ্যাসিডের মিশ্রণ, অন্য দু-চারটে জিনিসও থাকতে পারে। এরা দাদ হাজা সারানোর কাজটা করে মূলত রোগগ্রস্ত চামড়াটা তুলে দিয়ে, ফলে জ্বালা প্রায় অনিবার্য। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে এই সব ওষুধের প্রয়োজন ছিল, কেননা অন্য ওষুধ তেমন ছিল না, কিন্তু এখন এগুলো ব্যবহারের কোনও মানে নেই।

লেখক পরিচিতি : ডা. জয়ন্ত দাস, এমবিবিএস, এমডি, ত্বকরোগ বিশেষজ্ঞ।

গল্প নয়, সত্যি

‘পেশেন্ট পার্টি’-র রোজনামচা

ডা. শর্মিষ্ঠা দাস

সাত সকালেই দিনটা ‘দ’— ঘ্যানঘেনে বৃষ্টি, প্যাচপেচে পথঘাট, ‘No Refusal’ ট্যাক্সিও ট্যাকট্যাক করে কথা শুনিয়ে ‘Refuse’ করে সটকে পড়ল। কলকাতার অতি অভিজাত বেসরকারি হাসপাতালে অতি নিকট জনের সেদিন এক অঙ্গ প্রতিস্থাপনের কথা। আসল অঙ্গের জায়গায় বসবে কারখানায় তৈরি কৃত্রিম অঙ্গ প্রস্থেসিস।

ভোর ছ'টা থেকেই নাকি অপারেশন শুরু। অপারেশন থিয়েটারে ডাক্তার ঢোকার আগে পৌঁছাতেই হবে। কোনওরকমে হ্যাঁচোড়প্যাঁচোড় করে তো সাড়ে পাঁচটায় পৌঁছনো গেল। তিন চারটে পেল্লায় কাঁচের ফটক। উর্দিপরা সেপাই সান্ত্রীকে গেট পাস দেখানো, ফটক পেরনোর অনুমতি পাওয়া এসব করতে আরও কয়েক মিনিট। হুড়মুড়িয়ে হাজির হলাম রোগিণীর কাছে। করিডোরেই দেখা—তিনি সুদৃশ্য ট্রলিতে আধুনিক O.T. গাউন পরে শুয়ে শুয়েই হেসে হাত নেড়ে বললেন— ‘‘যমালয়ে জীবন্ত মানুষ ঢুকছি।’’

ওটির মুখে সেপাই-সান্ত্রী আরও বেশি, কী সুন্দর ব্যবস্থাপনা। সর্বদা সর্বত্র সুগন্ধি ফ্লোরমপিং। একদম ‘ডট’ টাইমমাফিক কাজ হচ্ছে। কী ঝকঝকে সব কিছু। নিজে দীর্ঘদিন সরকারি হাসপাতালে ডাক্তারি করে চুল পাকিয়েছি— দেয়ালে থুতু পানের পিক, মেঝেতে মলমূত্র, বমি, পেশেন্ট পার্টির ভাঙচুর গালাগালি সেখানে নিত্য সহচর। কাজেই অভিভূত হব তাতে আশ্চর্য কী।

ঈশ্বরপ্রতিম ডাক্তার একটা নির্দিষ্ট দরজা দিয়ে ঢুকবেন—তাঁর সঙ্গে কথা বলার জন্য সেপাই সান্ত্রীরা সেখানেই আমাদের দাঁড়াতে বলেছিলেন। মুগ্ধ চোখে চেয়ে চেয়ে দেখছি সব। কিন্তু মুগ্ধতারও সময়সীমা আছে, তা পেরিয়ে গেলে ঘোর কাটতেই দেখি ঘড়িতে দশটা। মানে চার ঘণ্টা দাঁড়িয়ে আছি ওই ভাবে। সুস্থ শরীরে বাইরে আমাদের এই যদি অবস্থা তা হলে ‘ওটি’-তে শুয়ে অপেক্ষারত রোগিণী টেনশনে কী করছেন, সেই চিন্তায় সেপাই সান্ত্রীদের জিজ্ঞাসা করলাম — ‘ওটি’ কখন শুরু হবে? ওঁরা ফোন ধরিয়ে দিলেন O.T. Co-ordinator-এর সঙ্গে কথা বলার জন্য। কোকিলকণ্ঠী অভিজাত উচ্চারণে বললেন— ‘‘ইওর পেশেন্ট'স অপারেশন ইজ গোইং অন স্মুদলি অ্যান্ড শি ইজ রেসপন্ডিং ফাইন’’ অর্থাৎ ‘‘আপনার রোগীর অপারেশন শুরু হয়েছে, দিব্যি চলছে, তিনি ভালই আছেন।’’ সেপাই- সান্ত্রীদের ভয়ে ভয়ে শুধোলাম — ডাক্তার কি অন্য কোনও দরজা দিয়ে ঢুকে গেছেন? তাঁরা বললেন—না না, এইটাই একমাত্র রাস্তা। তা হলে? খবরের কাগজে মাঝে মাঝে পড়ি আমাদের কোন্ সরকারি হাসপাতালে নার্সের বদলে গ্রুপ-ডি ইঞ্জেকশন দিয়েছে, ডাক্তারের বদলে ‘গ্রুপ-ডি’ সেলাই করেছে তাই নিয়ে শোরগোল। এখানে কী জানি—না না কোনও অমঙ্গল চিন্তা করব না—দুগ্‌গা দুগ্‌গা। আবার কিছু জিজ্ঞাসা করতেও ভয় করছে— আমাদের হাসপাতালে সারাদিনের চাপে বেশি প্রশ্ন করলে ‘পেশেন্ট পার্টি’-র কপালে খ্যাঁচানি অনিবার্য তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সেখানে তো সবকিছু চোখে দেখা যায়— এখানে এতগুলো দরজা— সব দরজার ‘‘পাসওয়ার্ড’’-ও জানি না। কপাল ঠুকে জিজ্ঞাসা করলাম আর একবার— ‘‘মানে ডাক্তারবাবু তো এখনও আসেননি। তা হলে?’’ না, এরা সত্যিই ভদ্র। একটুও চটল না। প্রসন্নতা মাখানো গলাতেই বলল— ‘‘হিজ টিম ইজ ওয়ার্কিং, ডোন্ট ওরি, হি উইল ইনস্টল দ্য প্রস্থেসিস। মানে হল, ডাক্তারবাবুর সঙ্গোপাঙ্গরা অপারেশন চালাচ্ছেন, ঘাবড়াবেন না, অঙ্গ-প্রতিস্থাপনের সময় স্বয়ং তিনিই সেটা করবেন। এর মাঝখানেই পি সি সরকারের ম্যাজিকের মত ডাক্তারবাবু ভেতরে ঢুকে গেলেন। এক ঘণ্টা পর ডাক পড়ল ওটি-র সামনে। অবিকল বাংলা সিনেমার মতো উনি বেরিয়ে বললেন—‘অপারেশন সাকসেসফুল।’ স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল অনেকক্ষণ বাদে।

এবার আমাদের পেটে কিছু পড়া দরকার। আমি সাধারণত বাইরের খাবার এড়িয়ে চলি। সঙ্গের আত্মীয়রা বললেন—চল চল, এখানে সবকিছু খুব হাইজিনিক। অগত্যা হাসপাতাল ক্যান্টিনে পুরি-সবজি।

রোগিণীকে বিশ্রাম নেওয়ার অবসর দিয়ে বাড়ি চলে এলাম। সন্ধ্যায় ভিজিটিং আওয়ার্সে গিয়ে দেখি রোগিণী বিড়বিড় করে নানা রকম অসন্তোষ প্রকাশ করছেন — কী ব্যাপার? না, ‘‘মুরগিতে অ্যালার্জি বলে মুরগি ছুঁই না, ভর্তির সময় হিস্ট্রি শীটে ‘এনি ফুড অ্যালার্জি’-তে ‘গার্লিক’ আর ‘চিকেন’ নিজে হাতে লিখেছি, তাও জোর করে দু'চামচ চিকেন স্যুপ গিলিয়ে দিল। একী অনাসৃষ্টি! খেতেই এই দ্যাখ্ গায়ে র‍্যাশ বেরিয়ে গেছে।’’ সত্যিই দেখি গায়ে কয়েকটা আমবাত। সিস্টারদের ডিউটি টেবিলে গিয়ে বলতে প্রথমেই শোনা গেল — ‘‘আর ইউ শিওর? ইউ ইনফর্মড বিফোর?’’ ঠিক বলছেন? অ্যালার্জির কথা আগে জানিয়েছিলেন? চেপে ধরে হিস্ট্রি শীট বার করতেই ঝোলা থেকে বেড়াল লাফাল। তখন নিরুত্তাপ মুখে দক্ষিণী ভগিনী বললেন— ‘‘সরি, ইউ শুড হ্যাভ ইনফর্মড দ্য ডায়েটিশিয়ান।’’ দুঃখিত, আপনার ডায়েটিশিয়ানকে জানানো উচিত ছিল। বলে অন্য কাজে মন দিলেন। লে হালুয়া! ডায়েটিশিয়ান ভগবানটি থাকেন কোথায়? রোগিণীকে আশ্বস্ত করে কাউন্টারে ডাক্তার পরিচয় দিয়ে আর এমও অর্থাৎ ছোট ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা বলব বললাম— তা আরএমও কে দেখে অবাক! ওমা, এ তো আমারই ছেলের বন্ধু। ‘‘তুই আবার কবে এখানে ঢুকলি? এই তো সবে ইন্টার্নশিপ শেষ হল!’’

প্রত্যুত্তরে ‘‘হ্যাঁ আন্টি’’—এবং জেন ওয়াই শ্রাগ।

বাইরে প্রিয় আত্মীয় বন্ধুরা অনেকে অপেক্ষা করছিলেন। বেরিয়ে এলাম— একটাই গেট পাস তো, এক একজন করে তাঁদের ঢোকার ব্যবস্থা করে দিতে। কেউই ভেতরে গিয়ে বিরক্ত করতে চাইলেন না রোগিণীকে। বললেন— ‘‘যা দরকার বলিস—আমরা বাইরে আছি। পেশেন্টের কাছে শুধু শুধু ভিড় বাড়ানো উচিত নয়, লৌকিকতা করতে গিয়ে পেশেন্টকে আর বিশ্রাম নিতে দেওয়া হয় না। আরও প্রিয় মনে হল ভাললাগা মানুষদের। আমাদের দেশে সবাই যে কবে এই কথাগুলো বুঝবে।

ভিজিটিং আওয়ার্স শেষ, বিশেষ কিছু করার নেই। এত ভাল চিকিৎসা কেন্দ্রে আছে। সবাই কিছুটা হাসি মুখেই আবার কফিশপে জমায়েত—এই ব্যস্ত বাজারে ছোটখাটো একটা ফ্যামিলি গেট টুগেদারও আজকাল এভাবেই হয়— মন্দ লাগল না ব্যাপারটা। আড্ডা —সবই স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যব্যবস্থা সংক্রান্ত—আর

চায়ের সঙ্গে টা। পরদিন এগারোটায় দেখা করতে যেতেই এবার বিড়বিড় নয়, রোগিণীর রীতিমত গজগজ, ''এই দ্যাখ্ স্যালাইন এক্সট্রা হয়ে গেছে, হাত ফুলে ঢোল—সিস্টাররা কোনও কথা কানেই নিচ্ছে না। কাল রাতে 'অনডেম' বমির ইঞ্জেকশন দু'বার দিতে এসেছিল— আমি বললাম দেখুন এটাই আধঘন্টা আগে দিয়ে গেছেন—ওরা বলল—হতেই পারে না। আমি বললাম...শেষে বলল—হ্যাঁ, হ্যান্ডওভারের সময় বলেনি, দেওয়া হয়েছে .... দেখলি তো? তোরা বলিস আমি বেশি বকবক করি! না দেখলে ... আই ভি ড্রিপের মধ্যে দিয়েই তো সব অ্যান্টিবায়োটিক ইঞ্জেকশনগুলো যাচ্ছে। ড্রিপ এক্সট্রা হয়ে গেলে সেটার কী হবে ... '' এই খানে বলে রাখি রোগিণীটি একটা তিয়াত্তর বছর বয়স্কা বিচ্ছু। ঘরে প্যারালাইজড স্বামীকে দেখাশোনা ও বাইরে ব্যাঙ্ক, পোস্টঅফিস, সবকিছু পায়ে হেঁটে নিজে করেন কারও মুখাপেক্ষী হবেন না এই প্রতিজ্ঞায়। এবং নিজে ডাক্তার-কন্যা ও ডাক্তার-মাতা বলে ডাক্তারিজ্ঞান প্রদর্শনের কিঞ্চিৎ সুযোগ পেলেই তো হাতছাড়া করেন না। এ যাত্রা সেটাই যে শাপে বর হবে তা টের পাওয়া গেল বারে বারেই।

'ড্রিপ এক্সট্রা' হওয়ার ব্যাপারটা দক্ষিণী ভগিনীকে কিছুতেই বোঝানো গেল না। অথচ সরকারি হাসপাতালে ছাত্রাবস্থা থেকেই এ ঘটনা ঘটলে পেশেন্টের বাড়ির লোককে 'মুষ্টিযোগ' অভ্যাস করতে দেখেছি জুনিয়র ডাক্তারদের কপালে অথবা কাঁচের টেবিলে (যে সংস্কৃতি কখনওই কাম্য নয়)।

আজকের ভগিনী দেখি ইংরাজিও বোঝেন না, হিন্দিও না। যাই বলি তিনি 'জাইগোমেটিকাস মেজর', —হাসতে কাজে লাগে যে পেশি— সেটার সংকোচন প্রসারণ করেন। অগত্যা 'আরএমও' শব্দটা বোধহয় বোধগম্য হল। আজ অন্য একটা পুঁচকে ছেলে ডিউটিতে। তাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে ইশারাতে ভগিনীকে অন্য হাতে ড্রিপ চালাতে বললেন। আমাদের সরকারি হাসপাতালে তো আজকাল ড্রিপ চালানো হয় 'জেলকো' — শিরার ভেতর অত্যন্ত সরু একটা নল দিয়ে যা রোগীর অনেক নড়াচড়াতেও নড়বে না, শিরা থেকে বেরোবে না, তাই দিয়ে। এখানে দেখলাম আমাদের ছাত্রাবস্থার বাটারফ্লাই ছুঁচ। বিশেষ কী কারণে তা বুঝলাম না। কিন্তু এটা তুলনায় সহজেই শিরা থেকে বেরিয়ে যায়, বা 'এক্সট্রা' হয়ে যায়।

পরদিন রোগিণীর বিড়বিড় গজগজ রূপান্তরিত হল প্রায় চিল চিৎকারে — ''এই দ্যাখ্, স্পাইনের ফুটো দিয়ে আমার ব্রেনের জল বেরিয়ে যাচ্ছে— ওরা গা মোছাতে গিয়ে ওখানে ঢোকানো নলটা ছিঁড়ে দিয়েছে— বারবার বলছি পিঠ ভিজে যাচ্ছে—ওরা বলছে, না, আপনি ঘামছেন!'' রোগিণীর গাউন তুলে ব্যাপারটা বুঝে এবার আমার ঘামার পালা। আর কী অসুবিধা হচ্ছে জিজ্ঞাসা করতেই রোগিণী বললেন— ''খুব মাথাব্যথা করছে—এতবড় একটা অপারেশনের ধকল তো।''

রোগিনী পাছে ঘাবড়ে যায় তাই মাথাব্যথার কারণটা আর খোলসা করে না বলে আত্মীয় বন্ধু কাউকে কিছু না বলে কাউন্টারে গিয়ে আরএমও-কে একটু মৃদু ধমকে বললাম—'ইন্টার্নশিপতো MCQ মুখস্থ করেই কাটিয়েছে, কাজ কিছু শেখেনি। এখনও ব্যাগ ঘাঁটলে স্টেথো হ্যামার না মিললেও ত্রিপাঠি গুপ্তা আর মুদিত খান্নার MCQ বই বেরোবে। আমরা দিনরাত ওয়ার্ডে বডি ফেলে ডাক্তারি শিখেছি। যাও বাছা, ওঁর বেডটা একটু ট্রেন্ডেলেনবার্গ করে দাও। ওঁকে এপিডুরাল ফেন্টানিল দেওয়া হচ্ছিল যে নলটা দিয়ে সেটা ছিঁড়ে গেছে, ওখানে এবং স্পাইনালের জায়গাতে কোনও আসেপটিক সিল করা নেই—CSF লিক করছে — কী কেলেঙ্কারি বুঝেছ?'' মনে পড়ে গেল, কিছুদিন আগে ভাইয়ের বন্ধুর মেয়ে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ব্রেন টিউমার অপারেশনের পর মারা গেল---- টিউমার বা অপারেশনের জন্য নয়---- মেনিঙ্গো-এনকেফেলাইটিসে। মনে পড়ছে ডা. গোস্বামীর কথা যিনি বিরাট এক আধা সরকারি হাসপাতালের অধিকর্তা ছিলেন— এক বেসরকারি হাসপাতালে তাঁকে 'এপিডুরাল ব্লক' দিতে গিয়ে ব্যাপারটা হাতের ভুলে স্পাইনাল হয়ে যায়— মৃতপ্রায় অবস্থায় কয়েকমাস সরকারি হাসপাতালে ভর্তি থেকে প্রাণ বাঁচে কিন্তু এখন বাকি জীবনের মতো হুইলচেয়ার তাঁর সঙ্গী। উঃ, এসব কথা কেন যে এমন বেয়াড়া সময়েই মনে পড়ে!

যাই হোক — আরএমও 'বাছা' নির্দেশ মেনে কাজটুকু করল। কিন্তু এ ধরনের বড় অপারেশনের শুধু ব্যথা কমানোর ওষুধ ইঞ্জেকশনে তেমন কাজ হয় না বলেই দু-একদিন মেরুদণ্ডের নার্ভে ওই ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়— নল ছিঁড়ে যাওয়ার ফলে সেই এপিডুরাল ইনফিউশন চালানো ওয়ার্ডে আরএমও-র পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই রোগিণীকে যন্ত্রণা সহ্য করতে হল। দক্ষিণী ভগিনী নির্বিকার, আর সেই এক হাসি বা জাইমেটিকাস মেজর সংকোচন। দায়িত্বপ্রাপ্ত ডাক্তার প্রতিদিনই নির্দিষ্ট সময়ে এসেছেন — নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু পৃথিবীর কোনও হাসপাতালেই কোনও ডাক্তারের পক্ষে সম্ভব নয় ২৪ ঘণ্টা সব রোগীকে আগলে বসে থাকা। এক্ষেত্রে চিকিৎসা-সংশ্লিষ্ট সমস্ত কর্মীকে সচেতন ও ওয়াকিবহাল থাকতে হয়। এখনও সরকারি হাসপাতালে এবং পৃথিবীর অন্যান্য জায়গায় বেশির ভাগ রোগীই ভাল থাকে ওয়ার্ডে নার্স ও অন্য কর্মীদের তৎপরতায় — এমনকী ঠিক কোন্ মুহূর্তে ডাক্তারকে ডাকতে হবে সেটাও এই তৎপরতার আওতায় ভুক্ত। কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম নামি দামি বেসরকারি হাসপাতালে 'নার্স' বলে যাঁরা কাজ করছেন তাঁদের ন্যূনতম চিকিৎসাজ্ঞানটুকু নেই দেখে আশ্চর্য হওয়া ছাড়া আর কী-ই বা করার ছিল।

আমি আর এরপর রোগিণীকে দেখতে যেতে পারলাম না— কারণ ভয়ানক আন্ত্রিক— সেদিন আমি নিজেই হাসপাতালে (বেসরকারি নয়!) ভর্তি, স্যালাইন ইত্যাদি। যে ডাক্তার আমাকে দেখছিলেন, বললেন, ''কোথায় খেয়েছিলেন? ওই ক্যান্টিনে? কিছুদিন কাজ করেছি ওই হাসপাতালে। ওই ক্যান্টিনের গ্লাভস্ টুপির আড়ালে কী যে আছে— নো ওয়ান নোজ বেটার দ্যান মি''।

দুগ্‌গা, দুগ্‌গা। বাড়ি ফিরেছি। ডাক্তার-কন্যা ডাক্তার-মাতা রোগিণীরও বড় অপারেশনটা আরোগ্যের পথে— কিন্তু তার হাতের শিরা থেকে বেরোনো অ্যান্টিবায়োটিক প্রবল প্রদাহের সৃষ্টি করেছে—আরও কতদিন ভোগাবে কে জানে।

নামী কাঁচের দরজা আর দামি প্যাকেজের আড়ালে অন্যদের রোজ কত কী ঘটে যাহা তাহা তা কি আর আমরা আমজনতা জানতি পারি? আর পারলেই বা কী? কতদিন আগেই আমরা বুঝে নিয়েছি না, সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার হাল অতীব খারাপ, বাঁচতে হলে বেসরকারি ডাক্তার বেসরকারি হাসপাতাল ছাড়া গতি নেই? বুঝে নিয়েছি—যত টাকা তত ভালো চিকিৎসা, যত দামি গাড়ি তত বড় চিকিৎসক, যত চকচকে হাসপাতাল বাড়ি যত ফটাফট ইংরাজি বুলি.. ইত্যাদি ইত্যাদি। এখন উলটো গাইলে চলবে? এত পয়সা খরচা করে বোকা বনলাম, মুখ ফুটে কথাটা বলতে লজ্জা হবে না!

চেপে যাই বরং, কী বলেন আপনারা?

সম্পাদকীয় মন্তব্য : গল্পচ্ছলে লেখা হলেও এটা বর্ণে বর্ণে সত্যি। এই লেখাটা লেখার সময়েও ডা. শর্মিষ্ঠা দাস অসুস্থ ছিলেন।

চেঙ্গাইলের শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্য কেন্দ্রে

ডায়াবেটিস রোগীদের চিকিৎসা— ৩ বছরের অভিজ্ঞতা

আজ থেকে বছর ২০-৩০ আগে ভারতবর্ষে ডায়াবেটিস ছিল শহুরে বড় লোকের অসুখ, গ্রামে ও মফস্‌সলে খেটে খাওয়া মানুষের মধ্যে এ রোগের দেখা মিলত না বললেই হয়। মাত্র কুড়ি বছরে অবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়েছে — গ্রামের গরিব মানুষের মধ্যে এখন অজস্র ডায়াবেটিস রোগী। এটা অকারণে হয়নি। আর সঠিক পূর্ণাঙ্গ রোগ-প্রতিরোধ ও চিকিৎসার সাহায্যে এই নতুন মহামারীকে ঠেকানোও সম্ভব— নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে লিখছেন **ডা. অভিজিৎ পাল।**

২০১১-র মে মাস থেকে আমি মাসে একদিন করে চেঙ্গাইলে শ্রমিক কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যাচ্ছি ডায়াবেটিস রোগীদের চিকিৎসা করতে। সেই অভিজ্ঞতা নিয়েই কিছু লিখছি, যা থেকে শহরতলির গরীব ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারগুলিতে এই রোগের প্রাদুর্ভাব ও তার চিকিৎসা সম্বন্ধে কিছু তথ্য আপনারা জানতে পারবেন। আমি কোনও পরিসংখ্যানের যাব না। শুধু এইটুকুই বলব যে ডায়াবেটিস রোগ এই সব গরিব ঘরেও ভাল রকম বাসা বেঁধেছে ও পিছিয়ে পড়া অর্থনীতিকে আরও কঠিন অবস্থায় ঠেলে দিচ্ছে।

আজ থেকে ৩০-৩৫ বছর আগে আমরা যখন মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র ছিলাম, আমাদের শিক্ষকরা আমাদের বলতেন যে ডায়াবেটিস অসুখটা শহুরে অসুখ ও শহরের মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্তের মধ্যেই পাওয়া যায়। গ্রাম বা আধা-শহরে খুব একটা পাওয়া যায় না। অর্থাৎ যারা কায়িক শ্রম করে তারা এই অসুখে ভোগে না। গত দু'দশক ধরে আমরা এই ধারণার পরিবর্তন লক্ষ্য করছি আর গত দশকে তো বন্যার জলের মতো এই অসুখটা গ্রামে গঞ্জে ছেয়ে গেছে। তারই প্রতিফলন আমরা দেখছি চেঙ্গাইলের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। এখনও শহরের (urban) মানুষের মধ্যে এটার প্রাদুর্ভাব বেশি, কিন্তু semi-urban (আধা শহর) ও rural (গ্রাম) অঞ্চলগুলো খুব বেশি পিছিয়ে নেই। আর বলাই বাহুল্য যে এই অসুখের সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে হলে চাই শিক্ষা ও অর্থবল — যে দুটোতেই এই সব এলাকাগুলো পিছিয়ে আছে। এই অবস্থাটা কিন্তু সারা ভারতবর্ষেই দেখা যাচ্ছে। বিজ্ঞানী ও ডাক্তাররা এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নিয়ে গত দু' তিন দশক ধরে অনেক গবেষণা করেছেন। কিছু কিছু তথ্য আমরা যা পেয়েছি সেগুলো আমি তুলে ধরছি।

(১) খাওয়া দাওয়ার কিছু গুণগত পরিবর্তন : প্রোটিনের অভাব, শর্করা-প্রধান (Carbohydrate rich) খাদ্য। সবুজ শাকসবজির (green vegetable) দাম বছরের বেশির ভাগ সময়ে বেশি থাকার দরুন তা মানুষের ক্রয়-ক্ষমতার বাইরে থাকছে। মাছ বা মাংস অর্থাৎ প্রোটিনের অভাব—কারণ, মানুষের গড়পড়তা যে আয় তাতে এই সব খাবার বিলাসিতার পর্যায়ে পড়ছে। আবার ডাল বা ভেজিটেবল প্রোটিন (নিরামিষ খাবারে যে প্রোটিন পাওয়া যায়) বা দুধের থেকে পাওয়া প্রোটিনও মানুষের পক্ষে সাধ্যাতীত হয়ে পড়েছে। সুতরাং পেট ভরাতে হচ্ছে শর্করা জাতীয় খাদ্য দিয়ে (যদিও চালের দামও খুব সুবিধার অবস্থায় নেই)। আবার সকালে বা বিকেলে ক্ষুধার তাড়নায় মানুষকে ফাস্ট ফুড জাঙ্ক ফুড বেশি খেতে হচ্ছে—যেমন রোল, চাউমিন, চপ্, সিঙ্গাড়া, কচুরি, মিষ্টি ইত্যাদি। বাড়ির ছোটদের মধ্যেই এর প্রবণতা বেশি, যুগের হাওয়ায় বলা যেতে পারে। ট্র্যাডিশনাল খাবার (ঐতিহ্যবাহিত চলে আসা খাদ্য) যেমন চিঁড়ে, মুড়ি ইত্যাদির প্রতি ঝোঁক কমে আসছে। খাদ্যাভ্যাসের এই পরিবর্তন দিনকে দিন বেড়েই চলেছে। গত দু দশকে গ্রামে গঞ্জে ছেয়ে গেছে ঠাণ্ডা পানীয়— কোকা কোলা, পেপসি ইত্যাদি। এই সব পানীয়তে উচ্চ ক্যালরি (High Calorie) থাকে। পকেটে দু' পয়সা যা থাকে তা দিয়ে এগুলো খাওয়ার রেওয়াজ হয়েছে ভীষণ। এটাকে বলা হচ্ছে (Coca-cola)-nisation বা Coca-colonisation of India (কোকা কোলার উপনিবেশবাদ)। এখন এই সব মানুষদের মধ্যেও আমরা দেখতে পাই ওবেসিটি (স্থূলত্ব), বড় পেট বা ভুঁড়ি বা 'thin fat man' (রোগা অথচ পেট মোটা মানুষ)। আর এটা থেকে তৈরি হচ্ছে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স (ইনসুলিন ভালভাবে কার্যকর হয় না), যা শেষ পর্যন্ত ডায়াবেটিস-এ দাঁড়ায়।

(২) কায়িক শ্রম অনেক সময় কমে যাচ্ছে : মোটরচালিত দ্বি-চক্রযান (বাইক, মোপেড্) ইত্যাদির ব্যবহার বেড়ে গেছে। কী করা যাবে — সময়ের অভাব। আবার শহরের মানুষের মতো টি.ভি. দেখাও বেড়েছে, যার ফলে বসে থাকাও (খেলাধূলা বা দৌড় ঝাঁপ না করে) বেড়েছে। অর্থাৎ যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে গ্রাম ও মফস্বলের মানুষরাও চলবার চেষ্টা করছে, যদিও এটা কেবল ক্ষতিই করছে।

(৩) জেনেটিক কারণ : আমাদের অর্থাৎ এই ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষদের মধ্যে এমন কিছু জিন্ (gene) আছে যাতে আমরা এই অসুখের কবলে পড়তে পারি বেশি। বিজ্ঞানে পরিভাষায় বলতে গেলে আমাদের ডায়াবেটিস হওয়ার জেনেটিক প্রবণতা বেশি।

(৪) **Barker hypothesis (বার্কারের তত্ত্ব)** বলছে যে মায়ের পেটে থাকাকালীন যদি মা অপুষ্টির শিকার হন তা হলে সেই বাচ্চার জন্মকালীন ওজন কম হয়। কম ওজন নিয়ে জন্মানো এই বাচ্চাদের পরবর্তী জীবনে ডায়াবেটিস হবার প্রবণতা বেশি। ভারতে এটা নিয়ে অসাধারণ গবেষণা করে পুণের ডা. যাজ্ঞিক (Dr. Yajnik) প্রমাণ করেছেন যে

ভারতীয়দের ক্ষেত্রে এটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সুতরাং বলা যেতে পারে গর্ভাবস্থা থেকে শুরু হয়ে যায় এই রোগের কবলে পড়ার প্রবণতা।

চেঙ্গাইলে ৩ বছরে বহু ডায়াবেটিস্ রোগী দেখার পর আমারও অনেক কিছু শেখা হয়েছে। সে অভিজ্ঞতা সবার সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাই।

১। ডায়াবেটিস এখন মফস্বল বা গ্রামের মানুষের কাছে খুব প্রাসঙ্গিক।

২। এদের কাছে রোগটা আরও কঠিন, কারণ এদের দারিদ্র ও শিক্ষার অভাব।

৩। প্রথাগত শিক্ষার অভাব থাকলেও, এখানকার চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীদের প্রচেষ্টায় এই মানুষগুলোর সচেনতা অনেক বেড়েছে।

৪। রোগ সম্বন্ধে বোঝালে এঁরা বুঝতে চান। পথ্যের ব্যাপারে আলোচনা করলে বোঝেন ও পরামর্শ মানেন। আবার অর্থের অভাবে অনেক সময় সঠিক পথ্য যোগাড় করতে অপরাগও হন।

৫। অনেক রোগীকে বুঝিয়ে বলায় তাঁরা ইনসুলিন নিচ্ছেন। নিয়মিত ইনসুলিন নিয়ে ভাল থাকলে আবার সেটা এসে ডাক্তারকে জানান। আমি প্রথমে ভাবতাম যে ইনসুলিনের নাম শুনলে বোধহয় আর হাসপাতাল-মুখো হবেন না। কিন্তু আমার ধারণাটা ভুল প্রমাণিত করেছেন অনেকেই।

৬। ট্যাব্‌লেটে (Tablet) কাজ হচ্ছে না এরকম রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। তাঁদের ইন্‌সুলিন দেওয়া হচ্ছে এবং তাঁরা মেনে নিচ্ছেন।

এখন আর আমরা ডায়াবেটিসকে শহরের প্রাচুর্যের অসুখ বলি না। এখন বলব এটা সর্বত্র দেখা যায়, ও কয়েকটা 'অভাবের' জন্য হয়— সঠিক, পুষ্টিকর খাবারের অভাব, অর্থাভাব, কায়িক শ্রমের অভাব, শিক্ষার অভাব। ডায়াবেটিস রোগ প্রতিরোধ করাটা অনেকটাই সাধ্যের মধ্যে।

Prevention of diabetes is now a reality – অর্থাৎ ডায়াবেটিস প্রতিরোধ করাটা এখন একটা পরীক্ষিত সত্য। সাধারণ গরিব মানুষের কাছে এটা বাস্তব রূপ নিক এটাই আমাদের স্বপ্ন ও জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের কর্মীদের কাছে এটাই কাঙ্ক্ষিত গন্তব্য।

লেখক পরিচিতি : ডা. অভিজিৎ পাল, এমবিবিএস, ডিটিএম অ্যান্ড এইচ, এমডি, ট্রপিকাল মেডিসিন বিশেষজ্ঞ। প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন; যুক্ত আছেন হাওড়ার শ্রমজীবী মানুষের জন্য গড়ে ওঠা একটা ক্লিনিকেও।

রেফার

শবনম ব্যানার্জি

ডাক্তারবাবু
আমি জানি আপনার হাসপাতালে
ওষুধ মজুত নেই কোনও
জানি ওসব সরকারের দায়িত্ব নয়
জানি বাজার, জানি প্রতিযোগিতা,
জানি আজ বাদে কাল
আমি আর ওষুধের খরচ যোগাতে পারব না
জানি ওষুধ কিনতে গিয়ে
আধপেটা খেয়ে থাকাটাই এ দেশের নিয়ম
জানি রক্তাল্পতা, জানি অপুষ্টি,
জানি সুযোগ-সন্ধানী জীবাণুদের আক্রমণ...

ডাক্তারবাবু, জানি আজ বা কাল আমি মরবই
এ পৃথিবীতে কোথাও আমার কোনও বেড নেই

শুধু যাওয়ার আগে একখান রেফার লিখে দিন না
নতুন পৃথিবীর প্রতি।

কবি পরিচিতি : ডা. শবনম ব্যানার্জী. এমবিবিএস, কলকাতার এক মেডিক্যাল কলেজে ইন্টার্ন।

advt.

একক মাত্রা

গদ্য প্রবন্ধের এক আধুনিক ক্যানভাস

সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, স্বাস্থ্য, মিডিয়া ও বিবিধ বিষয়ে এক অন্যতর গবেষণা ও আলোচনাপত্র
পাওয়া যাচ্ছে প্রায় সমস্ত স্টলে
গ্রাহক চাঁদা:১০০ টাকা (বার্ষিক), ২০০ টাকা (বার্ষিক), ২০০০ টাকা (আজীবন)
আজীবন গ্রাহকেরা পুরনো সংখ্যার একটি সেট বিনামূল্যে পাবেন।

যোগাযোগ :
১৫০, মুক্তারাম বাবু স্ট্রীট,
কলকাতা ৭০০০০৭
দূরভাষ : ৯৮৩০২৩৬০৭৬ / ৯৮৩০৪৯৩২৩৯

কালের ভালবাসা

সায়মদেব মুখার্জি

(**আগে যা হয়েছে :** দেড় বছর বয়সে এক অজানা জ্বরের পর থেকে ওমের মাংসপেশির ওপর নিয়ন্ত্রণ চলে যেতে শুরু করল। কলকাতার চিকিৎসক প্রথমে বলেছিলেন সেরিব্রাল পলসি, পরে ইংল্যান্ডের চিকিৎসক জানালেন তা নয়। কখনও বাবার কর্মসূত্রে উত্তরবঙ্গে, তারপর কলকাতায়। কখনও সাঁতারের প্রশিক্ষণ, তারপর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সেরিব্রাল পলসির শিক্ষা এবং মা-বাবার লড়াই কোথায় পৌঁছে দিল ওমকে?)

১৯৯০ এবং ১৯৯৪ সালের বিশ্বকাপ ফুটবলের মধ্যে এমন অনেক পার্থক্য ছিল, যে পার্থক্য মানুষের জীবনে থাকা মানে সেই মানুষটা একটা চূড়ান্ত সফলতার জায়গা থেকে একটা কালো কঠিন গহ্বরের মধ্যে পড়ে যেতে পারে।

সে কতটা ব্যথা মানসিক অভিব্যক্তি দিয়ে সারাতে পারে, সেটাই ওর কাছে হয়ে উঠল একটা চ্যালেঞ্জ।

দিয়েগো আর্মান্দো মারাদোনা ১৯৯০ এর বিশ্বকাপ ফুটবলের একজন অসাধারণ তারকা। ১৯৯৪-এ তাঁর নিজের দেশ ছাড়া বাকি পৃথিবীর কাছে হয়ে গেলেন ভিলেন। মাদকাচ্ছন্ন একজন মানুষ, কোকেন না হলে যাঁর এক দিনও চলে না। যে কোনও মাদকের নেশা মানুষের সার্বিক যন্ত্রণা ও মানসিক চিন্তা কমিয়ে দেয়। কিন্তু ওমের শরীরে ব্যথা কোনও কোনও সময় এমন মাত্রা ছুঁত, কোনও মাদকই সেই ব্যথা কমাতে পারতো কি না, জানা নেই। আর সেখান থেকেই ওমের জীবনে সবচেয়ে বড় বন্ধু হয়ে উঠল 'পেন কিলার'।

ওমের বাবা একজন শল্য চিকিৎসক হিসেবে ভালই কাজ করতেন। সেই তখন থেকেই তিনি ওমকে বলতেন— ''এই বয়ঃসন্ধির সময়ে তোমার শরীরে অনেক রকম গ্রোথ হরমোন কাজ করবে। তোমার শরীরের জয়েন্টগুলো আস্তে আস্তে বেঁকতে শুরু করেছে, দেখতে পাচ্ছ? এই জিনিসটা চলতে থাকবে। তোমাকে এই ব্যথা সহ্য করতে শিখতে হবে। পেন-কিলার তোমাকে কিছু সময়ের জন্য ভাল রাখবে। কিন্তু ভরপেট না খেয়ে কখনওই পেন-কিলার খাবে না।''

এ ভাবে ওমের জীবনে নতুন এক অধ্যায় শুরু হল। সে কতটা ব্যথা মানসিক অভিব্যক্তি দিয়ে সারাতে পারে, সেটাই ওর কাছে হয়ে উঠল একটা চ্যালেঞ্জ। কিছুটা ঔদ্ধত্য তার মানসিকতায় আসতে শুরু করল। একটা সময়ে এক ক্লাস টিচার ওমের মাকে বলেছিলেন, কেন ওমকে স্কুলে পাঠানো হয়। কিন্তু পরে ওম কিছুটা শান্তি পেল, তার স্বপ্ন বাসা পেল, যখন ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সেরিব্রাল পলসিতে ওমের সবচেয়ে প্রিয় টিচার, কম্পিউটারের টিচার সাথী আন্টি বিলেত থেকে ফিরে এলেন নতুন প্রযুক্তি নিয়ে, নিয়ে এলেন এমন কিছু প্রতিবন্ধকতাসম্পন্ন মানুষের জন্য, যারা আঙুল দিয়ে কম্পিউটারের কি-বোর্ড টাইপ করতে পারবে না। শরীরে যে কোনও একটা মাংসপেশির ওপরে যদি দখল থাকে, তা হলে একটা খুব সুন্দর কম্পিউটারের সুইচ সেই জায়গায় লাগিয়ে দেওয়া হলে একটা স্পেশ্যাল সফটঅয়্যারে যে কেউ কাজ করতে পারত। আর ওমের ক্ষেত্রে সেই একমাত্র মাংসপেশি ছিল তার জিহ্বা। সেই গ্রহ, যে গ্রহ মানুষকে বাক্যময় করে তোলে, সেই মঙ্গলের বসতস্থল এই জিহ্বা। কিন্তু কী অদ্ভুত ব্যাপার! জিভ কী অসাধারণ ভাবে সচল, অথচ মানুষটা কথা বলতে পারে না। ওমের বাবা বুঝিয়ে দিলেন, কথা বলতে গেলে মস্তিষ্কের নিউরোন থেকে শুরু করে, চোখ-কান থেকে শুরু করে কত কিছুকে কী ভাবে কাজ করতে হয়। ওমের মাথার নিউরোন হয়তো কাজ করতো, কিন্তু তার শরীরের মাংসপেশি নিউরোনের পাঠানো নির্দেশ কিছুতেই শুনতে চাইত না। কেন জানি না, সেই সময় থেকে ওমের মনে হতে লাগল, তার জীবনের বসবাস সব সময় কোনও এক খাদের কিনারাতেই হবে। এবং তাকে সব সময় তরোয়াল হাতে জেগে থাকতে হবে। রাতের ঘুমটা দরকার বলেই তাকে ঘুমোতে হবে। জীবন যে প্রতি মুহূর্তে মস্তিষ্ক দিয়েও বাঁচা যায়, সেই ভাবনা ওমকে আবার নতুন করে স্বপ্ন দেখতে সাহায্য করল। কোনও এক রূপকথার মতো সেই সময় ওম জানতে পারল, এক জনের জীবনের কথা। যাঁর জীবন শেষ হয়ে যাওয়ার কথা ২৮ বছর বয়সে, সেই সত্তরের দশকে, সেই স্টিফেন হকিং ২০১৪ সালেও বেঁচে আছেন এবং মানুষকে পদার্থবিদ্যায় দিয়ে যাচ্ছেন এমন কিছু ভাবনার বিষয় যা খুলে দিচ্ছে এক নতুন দিগন্ত। ওমের স্বপ্ন হয়ে উঠল— আমাকে একলব্যের মতো জীবনে এগোতে হবে। আর ওম জানত, দ্রোণের মতো তার গুরু তার কাছ থেকে গুরুদক্ষিণা চাইবেন না। আর ওমের জীবনের এই মহাভারতে অর্জুন কখনওই শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর হবেন না।

বাড়িতে বাবা ধীরে ধীরে ব্যবস্থা করতে লাগলেন ওমের উপনয়নের। উপনয়নের দিন আরেকটা ঘটনা ওমের জীবনকে নাড়িয়ে দিয়ে গেল। যদিও ওমের শরীরের ভারসাম্য ও মাংসপেশির ওপরে দখল আস্তে আস্তে একেবারেই চলে গিয়েছিল, ১৯৯৩ সালে এই প্রথাগত নব জন্মের আচার ওমকে শিখিয়ে দিল জীবনের কিছু মূল মন্ত্র। সারাদিনের নানা নিয়মকানুনের ক্লান্তির পর নতুন সন্ন্যাসী ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গেছিল, রাত্রি আটটার মধ্যেই, তার সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসী মনে মনে চেয়েছিল, এই ক্লান্তি যেন সারা জীবনের মতো তার জীবন থেকে চলে যায়। যখন রাত্রিবেলা অন্ধকারে ওমের ঘুম ভাঙলো, সে তার মাকে এক বারের জন্যও ডাকলো না সাহায্যের জন্য। ওম যদি বিবেকানন্দের সময়ে জন্মাত, তা হলে সেই মহাপুরুষকে পেত প্রতিবেশি হিসাবে। কিন্তু বিবেকানন্দের কিছু বাণী ওমের আত্মায় নতুন করে রোশনি ফেলল সেই অন্ধকার দণ্ডীঘরে।

"আপনি যদি আজ ওমের সঙ্গে দেখা করতে না পারেন, তবে এই ঘরে যাঁরা বসে আছেন, তাঁদের কারও অধিকার নেই আপনার শিষ্যের সঙ্গে দেখা করার।''

ধর্ম কী? সেই কথা ওম আরও এক বার জানতে পেরেছিল ঘুমোতে যাওয়ার আগে। জন্ম নিলেই কুল রক্ষা হয় না আর শিক্ষাগুরুকে সম্মান যে কোনও ভাবেই দেওয়া যায়। সেই বার্তা তাঁর কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন তার বাবা, সেই সন্ধ্যায়। তার প্রিয় শিক্ষিকা ঝর্ণা আন্টি দিনের শেষে একটু সময় বার করে যখন পৈতে বাড়িতে আসতে পারলেন, তখন তিনি ওমের বাবাকে বলেছিলেন, ''ওকে আজ এক বার দেখতে পেলাম না।'' ওমের বাবা ঘাড় ঘুরিয়ে বলেছিলেন, ''আপনি যদি আজ ওমের সঙ্গে দেখা করতে না পারেন, তবে এই ঘরে যাঁরা বসে আছেন, তাঁদের কারও অধিকার নেই আপনার শিষ্যের সঙ্গে দেখা করার।'' ওম আরও একবার বুঝতে পারল, সেই ছোট বয়সে, কোনও প্রথা বা নিয়ম চিরকালীন নয়। এই জগৎ পরিবর্তনশীল এবং সেই পরিবর্তনকে মানিয়ে নিতে না পারলে একজন প্রথম সারির মানুষকেও পিছিয়ে পড়তে হয়। ৮০-র দশকের সামাজিক কাঠামো এবং ৯০-এর দশকের সামাজিক কাঠামোর মধ্যে একটা তফাত যে থাকতেই হবে, সেটাও কাল বুঝিয়ে দিল ওমকে।

অন্যের কাছে যে জীবন প্রতিবন্ধকতার, তা হয়তো কালের এক অভিশাপ, কিন্তু কালের সন্তান ওম, তার এই জীবন প্রতিবন্ধকতায় বাঁধা, কষ্টে ভরা, তবু চারপাশ দেখে সে অনুভব করত, এটাই কালের ভালবাসা, সে অন্য রকম। একলব্যরা সব সময় হেরে যায় না।

(চলবে)

৮০-র দশকের সামাজিক কাঠামো এবং ৯০-এর দশকের সামাজিক কাঠামোর মধ্যে একটা তফাত যে থাকতেই হবে, সেটাও কাল বুঝিয়ে দিল ওমকে। অন্যের কাছে যে জীবন প্রতিবন্ধকতার, তা হয়তো কালের এক অভিশাপ, কিন্তু কালের সন্তান ওম, তার এই জীবন প্রতিবন্ধকতায় বাঁধা, কষ্টে ভরা, তবু চারপাশ দেখে সে অনুভব করত, এটাই কালের ভালবাসা,

লেখক পরিচিতি : সায়মদেব মুখার্জি, রেডিও জকি।

With Best Compliments from

Alteus Biogenics Pvt. Ltd.

Regd. Office : 18/61B Dover Lane, Kolkata - 700 029

Phone : 033 2486-7885 / 8087

Head Office : 14-B, Dover Lane, 1st Floor, Kolkata - 700 029

চি ঠি প ত্র

প্যারামেডিক্যাল ছাত্র এবং স্টাফ

প্যারামেডিক্যাল ছাত্র আর প্যারামেডিক্যাল স্টাফ — তাঁরা আছেন, কাজ করেন, তাঁরা না হলে হাসপাতাল - স্বাস্থ্য পরিষেবা অচল হয়ে পড়ে। কিন্তু তাঁদের প্রতি সরকার, শিক্ষক ও সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিটা ঠিক কেমন?

'প্যারামেডিক্যাল' এই শব্দটার গুরুত্ব কী, সেটা কি আপনাদের জানা আছে? না 'প্যারামেডিক্যাল' এই শব্দটার সঙ্গে আপনাদের পরিচিতি আছে? আমরা ডাক্তার নই- কিন্তু বেশ কিছু ডাক্তারি আমাদের শিক্ষা ও কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত। আমরা যে কাজটা করি, তাতে আমরা প্রত্যক্ষ ভাবে থেকেও থাকতে পারি না, তাই আপনারা আমাদের কথা জানতেও পারেন না। কারণ, আমাদের কাজ আপনার শরীরের রোগের কারণ খুঁজে বের করা এবং ডাক্তারকে আপনার চিকিৎসা করতে সাহায্য করা। কিন্তু আপনাকে এতগুলো কথা বলছি কেন? কারণ আমাদের বেশ কিছু সমস্যা আছে— তার মধ্যে সব থেকে বড় সমস্যা হল, আমাদের সরকারি চাকরি নেই। আজ প্রত্যেকটা হাসপাতালে ডাক্তার-নার্সের চাকরি হয়, কিন্তু টেকনিশিয়ানের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও কেন আমাদের চাকরি হয় না? আমরা দু'বছর ধরে যথেষ্ট পড়াশোনা করে এই টেকনিশিয়ান বা টেকনোলজিস্ট হই— কিন্তু চাকরি না পাওয়ার ফলে আমাদের বেসরকারি চাকরি করতে হয়, যেখানে আমাদের একজন দেখে শেখা মানুষের সমান বেতন দেওয়া হয়। তা হলে আমাদের এই দুই বছর পড়াশোনার মূল্য কোথায়? আমাদের এই পড়াশোনার কি কোনও দাম নেই? না কি আমাদের এই পড়াশোনার কোনও সম্মান নেই? সাধারণ মানুষ কেন আমাদের কোনও ছাত্রের মুখে 'প্যারামেডিক্যা ল ছাত্র' শুনতে পেলে নাক সিঁটকায়? আমরাও উচ্চমাধ্যমিকে বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করে যথেষ্ট নম্বর পেয়ে (নিম্নতম ৫০ শতাংশ) কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে সুযোগ পাই এই প্যারামেডিক্যাল কোর্সে পড়াশোনা করার জন্য। বহুদিন থেকে শোনা যাচ্ছে প্যারামেডিক্যা ল কর্মীদের স্থায়ী চাকরিতে সরকারি সমস্ত হাসপাতালে নিয়োগ করা হবে, কিন্তু এখনও হয়নি। আর যারা হয়েছে, তারাও অস্থায়ীভাবে। তার চাকরির কোনও স্থায়িত্ব নেই বলে তাকেও খুঁজতে হচ্ছে বেসরকারি সংস্থা। ফলে সে খাটছে দ্বিগুণ, কিন্তু উপার্জন করছে কম। এসব তো গেল চাকরি ভিত্তিক সমস্যা, এমন চলে আসি ছাত্র জীবনের বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে।

স্যার, ম্যাডামরা আমাদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করেন, যেমনটা তাঁরা তাঁদের বাড়ির পোষা প্রাণীর সঙ্গেও করেন না

আমাদের তিন মাস ইন্টার্নশিপ করতে হয়, তাতে আমরা মাত্র ৫০০ টাকা পাই। আপনারা বলুন তো, এই ৫০০ টাকার বিনিময়ে আজকের দিনে কী হয়?

প্রথমত, আমাদের কোনও নিজস্ব কলেজ নেই, বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজ এবং বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা আমাদের পড়াশোনার ভার বহন করে আমাদের স্টাডি সেন্টার হিসাবে। যার ফলে বিভিন্ন সমস্যার কথা আমরা আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রিন্সিপাল স্যার এবং কোনও কো-অর্ডিনেটের স্যারের কাছে গিয়ে বললে, তাঁদের সেই সকল সমস্যার সমাধান করার অধিকার থাকে না। আমাদের কলকাতা গিয়ে State Medical Faculty-তে জানাতে হয়। কারণ, আমাদের এই কোর্স চালায় এই State Medical Faculty— সরকার নয়। তাই আমাদের কোনও প্রকার সরকারি নথিভুক্তি নেই। আর সত্যি বলতে কী, স্যাররা আমাদের জন্য কিছু করতে পারেন না, না কি করার চেষ্টাই করেন না— সেটা আমাদের ঠিক জানা নেই। কারণ, আমরা কোনও ডিপার্টমেন্ট থেকে মনুষ্যসুলভ ব্যবহার পাই না। স্যার, ম্যাডামরা আমাদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করেন, যেমনটা তাঁরা তাঁদের বাড়ির পোষা প্রাণীর সঙ্গেও করেন না, এতটাই খারাপ! আমরা তো ছাত্র-ছাত্রী কিন্তু কলেজ আমাদের নয়, তাই সরস্বতী পূজার জন্য কোনও লেকচার থিয়েটারের পারমিশন চাইতে গেলে সেখানে প্রিন্সিপাল স্যার MBBS ছাত্রীদের 'আমাদের ছেলে মেয়ে' বলে স্বীকৃতি দেন— সেখানে আমরা হলাম 'বাইরের ছেলেমেয়ে'। কিন্তু সারা হাসপাতালের যত রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়, সব আমাদের করতে হয়। এই ছাত্রাবস্থায় তা হলে আমাদের কী অস্তিত্ব কলেজে? আমাদের বিভিন্ন কারণে কথায় কথায় স্যার ম্যাডামরা হুমকি দেন— ক্লিয়ারেন্স দেবেন না। আমরা ছাত্রছাত্রী। তাই আমাদের ক্লাস থাকাটা স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা এক ডিপার্টমেন্ট থেকে ক্লাস করে অন্য ডিপার্টমেন্টে কাজ করতে যেতে দেরি হলে আবার সেই একই হুমকি দেওয়া হয়— কেন বলতে পারেন? আমরা তো বিভিন্ন জায়গা থেকে বাড়ি ছেড়ে এসেছি এখানে পড়াশোনা করতে, কাজ করতে নয়। তা হলে এরকম ব্যবহার আমরা কেন পাই? আমাদের তিন মাস ইন্টার্নশিপ করতে হয়, তাতে আমরা মাত্র ৫০০ টাকা পাই। আপনারা বলুন তো, এই ৫০০ টাকার বিনিময়ে আজকের দিনে কী হয়? যাই হোক, আপনাদের অনেক সমস্যার কথাই বললাম, অনেক প্রশ্নও করলাম, এখন আপনারাই বিচারবিবেচনা করে দেখুন এবং আমাদের সকলের আপনাদের কাছে অনুরোধ যে আমাদের যে ন্যূনতম স্বীকৃতি পাওয়া দরকার সেই ব্যাপারে আপনারাও আমাদের সঙ্গে দেখুন। কারণ মেডিক্যাল কলেজের এত গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়েও আমাদের কোনও সরকারি স্বীকৃতি এবং সম্মান নেই।

সৌরদীপ দে ও দেবজ্যোতি সরকার
পশ্চিমবঙ্গের এক সরকারি মেডিক্যাল কলেজে ডিএমএলটি কোর্সের ছাত্র।